আলেয়া ও ঝিলিমিলি

(নাটিকা)

নজরুল ইসলাম

নাট্য-নিকেতনে অভিনীত-

পৌষ ১৩৩৮

দুই টাকা মাত্র

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি, এম্, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত. শ্রীসুকুমার চৌধুরী, কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রেস ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

নট-রাজ্যের চির-নৃত্য-সাথী

সকল নট-নটীর নামে

"আলেয়া" উৎসর্গ করিলাম

এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলা-ভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী—চিরকালের নর-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হ'ল, তাই নিয়ে এই গীতি নাট্য।

তিনটি পুরুষ

মীনকেতু—রূপ-সুন্দর।

চন্দ্রকেতু—মহিমা-সুন্দর, ত্যাগ-সুন্দর।

উগ্রাদিত্য—শক্তি-মাতাল।

তিনটি নারী।

কৃষ্ণা—চির-কালের ব্যর্থ-প্রেম নারী, জীবনে সে কাউকে ভালোবাস্‌তে পারলে না—এই তার জীবনের চরম দুঃখ।

জয়ন্তী—যে-তেজে যে-শক্তিতে নারী রাণী হয়, নারীর সেই তেজ সেই শক্তি।

চন্দ্রিকা—চির-কালের কুসুম-পেলব প্রাণ-চঞ্চল নারী, যে শুধু পৌরুষ-কঠোর পুরুষকে ভালোবাস্‌তে চায়! মরুভূমির পরে যে বন-শ্রী, সংগ্রামের শেষে যে কল্যাণ, এ তাই। এরই তপস্যায় পশু-নর মানুষ হয়, মৃত্যু-পথের পথিক প্রাণ পায়।…

নারীর হৃদয়—তাদের ভালোবাসা কুহেলিকাময়। এও এক আলেয়া। এ যে কখন্ কা'কে পথ-ভোলায়, কখন্ কা'কে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।

যাকে সে চিরকাল অবহেলা ক'রে এসেছে,—তাকেই সে ফিরে পেতে চায় তার চ'লে যাওয়ার পরে। যাকে সে চিরদিন চেয়েছে, সে তখন তার চ'লে-যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পিছনে প'ড়ে যায়।

পুরুষও তেমনি হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে। তাই তার কাছে আজকার সুন্দর, কাল হ'য়ে ওঠে বাসি। হৃদয়ের এই তীর্থ-পথে তার যাত্রার আর শেষ নেই। তাই সে এক মন্দিরে পূজা নিবেদন ক'রে আর মন্দিরের বেদীতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হৃদয়ের এই রহস্যই মানুষকে করেছে চির-রহস্যময়, পৃথিবীকে করেছে বিচিত্র-সুন্দর।

"আলেয়া" তারি ইঙ্গিত।

কুশীলবগণ

মীনকেতু	....	...	গান্ধার-রাজ
চন্দ্রকেতু	...	...	ঐ সেনাপতি
কৃষ্ণা	...	....	ঐ প্রধানা মন্ত্রী
কাকলি	...	...	ঐ প্রধানা গায়িকা
রঙ্গনাথ	...	...	ঐ বয়স্য
মধুশ্রবা	...	...	ঐ সভাকবি
জয়ন্তী	...	...	যশল্মীরের রাণী
চন্দ্রিকা	...	...	ঐ কনিষ্ঠা সহোদরা
উগ্রাদিত্য	...	...	ঐ সেনাপতি

সৈন্যগণ, প্রমোদ উদ্যানের সুন্দরীগণ, যোগিণীগণ ইত্যাদি

আলেখ্য

প্রস্তাবনা

[অন্ধকার নিশীথিনী। আলেয়ার আলো মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া যাইতেছে। দিশেহারা পথিক তাহারি পিছনে ছুটিয়া পথ হারাইতেছে।...... আলেয়ার নৃত্য ও তাহারি অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে দিশেহারা পথিকের গীত।]

(গান)

পথিক ॥

নিশি নিশি মোরে ডাকে সে স্বপনে।
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে।

জানিনা মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরাণ টানে
ঘু'রে ঘু'রে মরি আঁধার গহনে ॥

শত পথিকে ও রূপে ছল হানে,
অপরূপা শত রূপে শত গানে।

পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশী,
সে সুরে নিখিল-মন উদাসী,
দহে যাদুকরী বিধুর দহনে ॥

[গান শেষ করিয়া পথিকের প্রস্থান

আলেয়া

[গান ও নৃত্য করিতে করিতে দুইটি প্রজাপতির প্রবেশ]

(গান)

প্রজাপতিদ্বয় ॥

জ্বলে আলো শতদল ঝলমল ঝলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙীন লঘু চপল ॥

যদি অনল-শিখায় এপাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি—ভালবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল ॥

কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বেঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল— ফুলঝরা বনতল ॥

চলিতে ফুলদলি, চাহে যে তারে ছলি
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছল ॥

[গীত-শেষে প্রজাপতি দুইটি আলেয়ার নিকট যাইতেই আলেয়া নিভিয়া গেল। আলেয়া নিভিয়া যাওয়ার সাথে সাথে কয়েকটি রক্ত-বাস পুষ্পতনু-কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রজাপতি দুইটি তাহাদের দেখিয়া তাহাদের দিকে উড়িয়া গেল। প্রজাপতি ও সেই কিশোরীদের গান।]

(গান)

কিশোরীরা ॥ মোরা ফুটিয়াছি বঁধু
হের তোমারি আশায়।

প্রথম কিশোরী ॥ আমি অনুরাগ-রাঙা
আমি গোলাব শাখায় ॥

দ্বিতীয় কিশোরী ॥ বন- কুন্তলে গরবী
আমি কানন-করবী !

তৃতীয় কিশোরী ॥ আমি সরসী-কমলা
আমি ষোড়শী কমলা।

চতুর্থ কিশোরী ॥ আমি চম্পক খোঁপায় ॥

প্রজাপতিদ্বয় ॥ নিভিল আলেয়া-আলো পথ চলিতে
তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।

কিশোরীরা ॥ মোরা অনির্ব্বাণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম রাঙা আমরা জ্যোতি।

প্রজাপতিদ্বয় ॥ মোরা চাহিনাকো প্রেম, চাহি মোহিনী মায়ায় ॥

[গীত শেষে প্রজাপতি দুইটি ও কিশোরীগণ অন্ধকারের যবনিকা ঠেলিয়া উষার দীপ্তি দেখাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেল।]

প্রথম অঙ্ক

[গান্ধার-রাজের প্রমোদ-উদ্যান ও দরদালান। পশ্চাতে পর্ব্বতমালা। পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ঝর্ণাধারা বহিয়া যাইতেছে। অনতিদূরে দেখা যাইতেছে গান্ধার রাজপ্রাসাদ— রুধির-পালঙ্ক প্রস্তরের।......রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে। পর্ব্বত-চূড়ায় পাণ্ডুর-গণ্ড কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ। ধীরে ধীরে উষার রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিতেছে। ঝর্ণাধারায় সেই রং প্রতিফলিত হইয়া গলিত রামধনুর মত সুন্দর দেখাইতেছে।......প্রমোদ-উদ্যানের অলিন্দে বাহু উপাধান করিয়া নিশি-জাগরণ-ক্লান্ত সম্রাটের প্রমোদ-সঙ্গিনী তরুণীরা কিশোরীরা স্খলিত অঞ্চলে ঘুমাইতেছে।......সহসা রাজপুরীর তোরণদ্বারে প্রভাতী সুরে বাঁশী ফুকারিয়া উঠিল। ঘুমন্ত তরুণীর দল সচকিত হইয়া জাগিয়া তন্দ্রালস করে তাহাদের বসনভূষণ সম্বৃত করিতে লাগিল।]

[ভোরের হাওয়ার গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ]

(গান)

ভোরের হাওয়া ॥

পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব ডাকিছে পাখী ॥
ঐ বংশী বাজে দূরে শোনো ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খুলি' দ্বার বঁধুরে লহ গো ডাকি ॥

[প্রস্থান

(গান)

সুন্দরীরা ॥

ভোরের হাওয়া, এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা
গুণ্ঠিতারে শুনাতে ॥

হিম-শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দুই পাণি
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি—
বিশ্ব-সুষমা-সভাতে ॥

[সহসা শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। প্রধানা গায়িকা কাকলি গান করিতে করিতে চলিয়া গেল]

(গান)

কাকলি ॥

ফুল কিশোরী! জাগো জাগো, নিশি ভোর।
দুয়ারে দখিণ হাওয়া—খোল খোল পল্লব-দোর ॥
জাগাইয়া ধীরে ধীরে—যৌবন তনু-তীরে
চ'লে যাবে কিশোর ॥

[প্রস্থান

সুন্দরীরা ॥

চিনি ও নিঠুরে চিনি
পায়ে দলে মন জিনি'
ভেঙোনা ভেঙোনা ঘুম-ঘোর।
মধুমাসে আসে সে যে ফুলবাস-চোর ॥

[একটু পরেই হাসিতে হাসিতে সম্রাট মীনকেতু ও পশ্চাতে সভাকবি মধুশ্রবার প্রবেশ]

মীনকেতু ॥ (তরুণী কিশোরীদের কাহারো গালে, কাহারো অধরে তর্জ্জনী দিয়া মৃদু টোকা দিতে দিতে, কাহারো খোঁপা খুলিয়া দিয়া, কাহারো বেণী ধরিয়া টানিয়া ফেলিতে ফেলিতে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া) সুন্দর! কেমন কবি?

কবি ॥ শুধু সুন্দর নয় সম্রাট, অপরূপ! ঐ লতার ফুল সুন্দর, কিন্তু এই রূপের ফুলদল অপরূপ!

মীনকেতু ॥ (কবির পিঠ চাপড়াইয়া) সাধু কবি, সত্যই এ অপরূপ!—জান কবি, এঁদের সকলেই আমার স্বদেশিনী নন্, এঁরা শত দেশের শত-দল। আমার প্রমোদ-কাননে এঁদের সংগ্রহ করেছি বহু অনুসন্ধান ক'রে। (পশ্চাতে পর্ব্বত গাত্রে প্রবাহিতা ঝর্ণা দেখিয়া) পশ্চাতে ওই উদ্দাম জলপ্রপাত, আর সম্মুখে এই রূপ-যৌবনের উচ্ছল ঝর্ণাধারা;

মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, তৃষ্ণার্ত্ত ভোগলিপ্সু পুরুষ, যৌবনের দেবতা! (পায়চারি করিতে করিতে) আমি চাই—আমি চাই—

কবি॥ "আমরা জানি মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া"—

মীনকেতু॥ হাঁ, ঠিক বলেছ কবি, চোখ পুরে রূপ চাই, পাত্র পুরে সুরা চাই! (হঠাৎ হাসিয়া তরুণী ও কিশোরীদের কাছে গিয়া) তুই কে রে?—বস্‌রা গোলাব বুঝি? বাঃ, যেমন রং, তেমনি শোভা, ঠোঁটে গালে লাল আভা যেন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।......তুই—তুই বুঝি ইরাণী নার্গিশ?...হাঁ, নার্গিশ ফুলের পাপ্‌ড়ীর মতই তোর চোখ! ভূরু ত নয়, যেন বাঁকা তলোয়ার; আর তার নিচেই ওই চক্‌চকে চোখ যেন তলোয়ারের ধার! ওঃ তাতে আবার কালো কাজলের শান দেওয়া হ'য়েছে! একবার তাকালে আর রক্ষে নেই! (বুকে হাত দিয়া) একেবারেই ইস্‌পার উস্‌পার! (অন্য দিক দিয়া) আহা, তুমি কে সুন্দরী? তুমি বুঝি বঙ্গের শেফালি! (কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শেফালি ফুলের মতই তোমার শোভা, শেফালি-বৃন্তের মতই তোমার প্রাণ বেদনায় রাঙা!—আর তুমি? তুমি বুঝি সুদূর চীনের চন্দ্র-মল্লিকা? তোমার এত রূপ, কিন্তু তুমি অমন ভোরের

চাঁদের মত পাণ্ডুর কেন? অ! তোমার বুঝি এদেশে মন টিঁক্‌ছে না?—তা কি কর্‌বে বল, টিক্‌তেই হবে, না টিকে উপায় নেই! আমি যে তোমাদের চাই। গাও, গাও, মন টেঁকার গান গাও। যে-গান শুনে সকালবেলার ফুল বিকালবেলার কথা ভুলে যায়, ভোরের নিশি সূর্য্যোদয়ের কথা ভোলে; বনের পাখী নীড়ের পথ ভোলে—সেই গান।

(সুন্দরীদের গান ও নৃত্য)

(গান)

সুন্দরীরা ॥

যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল্।
ধরণীর তরণী টল্‌মল্ টল্‌মল্ ॥
কূলের বাঁধন খোল্
আয় কে দিবি রে দোল,
প্রাণের সাগরে রোল ওঠে ঐ কল্‌কল্ ॥
তটে তটে ঘট-কঙ্কনে নট-মল্লারে ওঠে গান,
মুখে হাসি বুকে শ্মশান।
আজিও তরুণী ধরা রঙে রূপে ঝলমল্,
রূপে রসে ঢলঢল্ ॥

[ম্লানমুখে কৃষ্ণার প্রবেশ]

মীনকেতু ॥ ও কে?—কৃষ্ণা? প্রধানা মন্ত্রী?—তারপর, এমন অসময়ে এখানে যে!

কৃষ্ণা॥ বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে আপনার আনন্দের বাধা হ'য়ে এসেছি সম্রাট্‌!

[সভাকবি এতক্ষণ এক ফুল হইতে আর-এক ফুলের কাছে গিয়া কি যেন দেখিতেছিলেন, কৃষ্ণার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন]

কবি॥ এ ফুল-সভায় ত রাজসভার মন্ত্রীর আসার কথা নয় দেবী!

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) ঠিক বলেছ কবি, যেমন আমি এখানে এসেছি মীনকেতু হ'য়ে—সম্রাট্‌ হ'য়ে নয়!

কৃষ্ণা॥ আমিও ফুলবনে আসি কবি। তবে তোমাদের মত আয়োজনের আড়ম্বর নিয়ে আসিনে। আমি কৃষ্ণা, নিশিথিনী। আমি নীরবে আসি, নীরবে যাই। হয়ত-বা আমার চোখের শিশিরেই তোমাদের কাননের ফুল ফোটে! (সম্রাটের দিকে তাকাইয়া) আমি তাহ'লে যেতে পারি সম্রাট ?

মীনকেতু॥ রাজ্যের ব্যাপার রাজসভাতেই ব'লো কৃষ্ণা, —এখানে নয়। কিন্তু এসেছ যখন, গায়ে একটু ফুলেল্‌ হাওয়ার ছোঁয়াচ না-হয় লাগিয়েই গেলে! ওঃ, ভু'লে গিয়েছিলুম, ওতে বোধ হয় তোমার মন্ত্রীত্বের মুখোসটা খু'লে কৃষ্ণার মুখোস বেরিয়ে পড়্‌বে! রাত্রির আবরণ খু'লে চাঁদের আভা ফু'টে উঠ্‌বে।

কৃষ্ণা ॥ (ধীর স্থির কণ্ঠে) সম্রাটের কি এটা জানা উচিত নয়, যে, তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর সাথে এই নটীদের সাম্‌নে এই ব্যবহার আমাদের সকলেরই মহিমাকে খর্ব্ব করে!

[সম্রাটের ইঙ্গিতে তরুণী ও কিশোরীর দল অভিনন্দন করিয়া চলিয়া গেল]

মীনকেতু ॥ (কৃষ্ণার হাত ধরিয়া) ওরা নটী নয় কৃষ্ণা, ওরা আমার প্রমোদ-সহচরী। আমি রাজার মহিমার মুখোস খু'লে এ প্রমোদ-কাননে আসি ওদের নিয়ে আনন্দ কর্‌তে।

কৃষ্ণা ॥ (হস্ত ছাড়াইয়া) আমি জানি, সম্রাট, যে, নারীজাতিকে অবমাননা কর্‌বার জন্যই আমায়, একজন নারীকে, আপনার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রূপ করেছেন! অথবা এ হয়ত আপনার একটা খেয়াল! কিন্তু সম্রাট্, আপনার যা খেলা, তা হয়ত অন্যের মৃত্যু!

মীনকেতু ॥ (হাসিয়া) তুমি যে আজকাল এতটুকু রহস্যও সহ্য কর্‌তে পার না কৃষ্ণা! যে দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে দেশ থেকে বুড়োগুলোকে তাড়ালুম, তারা দেখ্‌চি দল বেঁধে তোমার মনে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে চোখ তুল্‌তেই দেখ্‌ব, তোমার মুখে দাড়ির বাজার ব'সে গেছে!

কবি॥ বুড়োর দাড়ি এম্‌নি ক'রেই প্রতিশোধ নেয় সম্রাট্‌। মুখের দাড়ি মনে গিয়ে বোঝা হ'য়ে ওঠে!

(গান)

এসেছে নব্‌নে বুড়ো যৌবনেরি রাজ-সভাতে।
কুঁজো-পিঠ বই ব'য়ে হায় কলম-ধরা ঠুঁটো হাতে॥

ভরিল সৃষ্টি এবার দৃষ্টি খাটো যষ্টি-ধরা জ্যেষ্ঠতাতে।
নাতি সব স্বপ্‌নখার নাকি কথার ভুষুণ্ডি মাঠ
আঁধার রাতে॥

দাওয়াতে টান্‌ছে হুঁকো, উনুন-মুখো,
নড়েও না কো ন্যাজমলাতে।

ভাই সব বল হরি, কল্‌সী দড়ি, ঝুলিয়েছে
নিজেই গলাতে॥

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) সত্য বলেছ মধুশ্রবা, বৃদ্ধত্ব আর সংস্কারকে তাড়ানো তত সহজ নয় দেখ্‌ছি। ওরা কোন্‌ সময় যে শ্রীজ্ঞানামৃত বিতরণের লোভ দেখিয়ে তরুণ-তরুণীর মন জু'ড়ে বসে, তা দেবা ন জানন্তি। আমি যৌবনের হাট বসাব ব'লে সাম্রাজ্যের বাইরে পিঁজরাপোল করে বুড়ো মনের লোকগুলোকে রেখে এলুম, তারা কি আবার ফিরে আস্‌তে আরম্ভ করেছে? (কৃষ্ণার পানে তাকাইয়া) দেখ

কৃষ্ণা, আমি তরুণীদের কাছে কিছুতেই গম্ভীর হ'তে পারি নে। সুন্দরের কাছে রাজমহিমা দেখানোর মত হাসির জিনিষ আর-কিছু কি আছে? ধর, এই ফোটা ফুলের আর ওই সব উন্মুখ যৌবনা কিশোরীদের কাছে এমন সুন্দর সকালটা যদি রাজ্যের কথা ক'য়ে কাটিয়ে দিই—ও কি কৃষ্ণা, হাস্‌ছ?

কৃষ্ণা॥ মার্জ্জনা কর্‌বেন সম্রাট্! আমিও আপনার ঐ আনন্দ হাসির তরঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে যাই, ভুলে যাই আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট্, আর আমি তাঁর প্রধান মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) মনে হয় আপনি আমার সেই ভুলে-যাওয়া দিনের শৈশব-সাথী!

কবি॥ সম্রাট, একজনের মুখ যখন আর-একজনের কর্ণমূলের দিকে এগিয়ে আসে, তখন লজ্জার দায় এড়াতে তৃতীয় ব্যক্তির সেখান থেকে সরে' পড়াই শোভন এবং রীতি।

[প্রস্থান

মীনকেতু॥ (হাসিয়া কবির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া—কৃষ্ণার পানে ফিরিয়া) তুমি আমায় জান কৃষ্ণা, আমি সিংহাসনে যখন বসি, তখন আমি ঐ—কেবল তোমরা যা বল—মহিমময় সম্রাট, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ করি তখন আমি রক্ত-পাগল সেনানী. কিন্তু সুন্দর ফুলবনে আমিও সুন্দরের খেয়ালী, হয়ত-বা কবিই! যেখানে শুধু তুমি আর আমি,

সেখানে তুমি আমায় সেই ছেলেবেলার মত ক'রেই ডাক-নাম ধ'রে ডেকো!

কৃষ্ণা॥ জানিনা, তুমি কি! এতদিন ধ'রে ত তোমায় দেখেছি, তবু যেন তোমায় বুঝতে পারলুম না। আকাশের চাঁদের মতই তুমি সুদূর, অমনি জ্যোৎস্নায় কলঙ্কে মাখামাখি।

মীনকেতু॥ তবুও ওই সুদূর কলঙ্কী-ই ত পৃথিবীর সাত সাগরকে দিবারাত্রি জোয়ার-ভাঁটার দোল খাওয়ায়!

কৃষ্ণা॥ সত্যিই তাই। এম্‌নি তোমার আকর্ষণ! (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা মীনকেতু, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলে—মনে পড়ে?

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) চাঁদ কাকে ভালোবাসে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা॥ ও কলঙ্কী, ও হয়ত কাউকেই ভালোবাসে না।

মীনকেতু॥ (হাততালি দিয়া) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, ওই কলঙ্কীকেই সবাই ভালোবাসে, ও কাউকে ভালোবাসে না।

[গান করিতে করিতে একটি মেয়ের প্রবেশ]

(গান)

মেয়েটি॥

কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয়
যদি ঠেলিবে পায়ে॥
বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে।
একা বন-কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে॥

ছিল পাশরি' আপন বেভুল কিশোরী হিয়া
বধূর বিধুর যৌবন কেন দিলে জাগায়ে।
প্রিয় গো প্রিয়—
অকাশ বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি
দিলে রাঙায়ে ॥

মেয়েটি ॥ রাজা, কাল রাতে তোমার অনুরাগ দিয়ে আমায় বিকশিত করেছিলে। আমার সেই বিকশিত ফুলের অর্ঘ্য তোমায় দিতে এসেছি। তুমি বলেছিলে······

মীনকেতু ॥ (হাসিয়া) সুন্দরী, রাত্রে তোমায় যে-কথা বলেছিলুম, তা রাত্রের জন্যই সত্য ছিল। দিনের আলোকেও তা সত্য হবে এমন কথা ত বলিনি। রাত্রে যখন কাছে ছিলে, তখন তুমি ছিলে কুমুদিনী, আমি ছিলুম চাঁদ। এখন দিন যখন এল, তখন আমি হলুম সূর্য্য, আমি এখন সূর্য্যমুখীর —কমলের! যাও! চ'লে যাও! বিকশিত হয়েছ, এখন সারাদিন চোখ বুজে থেকে সন্ধ্যেবেলায় ঝ'রে পড়ো! যাও!

[ম্লানমুখে দুইহাতে চোখ ঢাকিয়া মেয়েটির প্রস্থান]

কৃষ্ণা ॥ (আহত স্বরে) মীনকেতু!

[মীনকেতু হো হো করে হেসে উঠল]

[গান করিতে করিতে আর একটি মেয়ের প্রবেশ। নাম তার মালা]

(গান)

মালা ॥

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
নিবিড় সুখে সয়েছি বুকে তোমার হাতের সূচীর জ্বালা।
এখনো জাগে লোহিত রাগে
রঙন গোলাবে তাহারি ব্যথা,
তোমার গলে দুলিব ব'লে
দিয়েছি কুলে কলঙ্ক কালা ॥

যদি ও-গলে নেবে না তু'লে
কেন বধিলে ফুলের পরাণ,
অভিমানে হায় মালা যে শুকায়,
ঝ'রে ঝ'রে যায় লাজে নিরালা ॥

মীনকেতু ॥ তুমি আবার কে সুন্দরী ?

মালা ॥ সম্রাট্, চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমার নাম মালা! কাল সারারাত যে তোমার গলা জড়িয়ে ছিলুম! আমি ছিলুম কাঁটাবনের ছড়ানো ফুল, তুমিই ত আমায় মালা ক'রে সার্থক করেছ!

মীনকেতু ॥ আঃ, তুমি যদি সার্থকই হ'য়ে গেলে, তবে

আবার কেন ? এখন তোমার সুতো থেকে একটি একটি ক'রে ফুল ঝ'রে পড়ুক ! ফুল ফুট্‌লে ওকে যেমন মালা গেঁথে সার্থক করতে হয়, তেমনি রাত্রিশেষে সে বাসিমালা ফেলেও দিতে হয় !

[বুক চাপিয়া ধরিয়া মালার প্রস্থান

কৃষ্ণা ॥ উঃ ! আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছিনে ! মীনকেতু ! তুমি কি ?

মীনকেতু ॥ হাঁ, ওই ওর নিয়তি। রাত্রের বাসিফুলকে রাত্রিশেষেও যে আঁকৃড়ে প'ড়ে থাকে, তার সহায়-সম্বল ত নেই-ই, তার যৌবনও ম'রে গেছে।

কৃষ্ণা ॥ নিষ্ঠুর ! তোমার কি হৃদয় ব'লে—মনুষ্যত্ব ব'লে কিছু নেই ?

মীনকেতু ॥ (হাসিয়া) আমি মনুষ্যত্বের পূজা করি না কৃষ্ণা ! আমি যৌবনের পূজারী ! ফুল আর হৃদয় দ'লে চলাই আমার ধর্ম্ম।

কৃষ্ণা ॥ তোমায় দেখে বুঝ্‌তে পারি মীনকেতু, কেন শাস্ত্রে বলে পাপের দেবতা মারের চেয়ে সুন্দর এ বিশ্বে কেউ নেই।

মীনকেতু ॥ (হাসিয়া কৃষ্ণার গালে তর্জ্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিতে করিতে) ঠিক বলেছ কৃষ্ণা, মারের চেয়ে,

মিথ্যার চেয়ে, মায়ার চেয়ে কি সুন্দর কিছু আছে? চাঁদে কলঙ্ক আছে বলেই ত চাঁদ এত আকর্ষণ করে; তোমার কপালের ঐ কালো টিপটাই ত তোমার মুখের সমস্ত লাবণ্যকে হার মানিয়েছে। রামধনু মিথ্যা বলেই ত অত সুন্দর! যৌবন ভুল করে পাপ করে বলেই ত ওর উপর এত লোভ, ও এত সুন্দর!

[মুখে চোখে বিলাস ক্লান্তির চিহ্নযুক্তা মদোন্মত্তা এক নারীর টলিতে টলিতে প্রবেশ]

(গান)

মদালসা ॥

কেন রঙীন্ নেশায় মোরে রাঙালে।
কেন সহজ ছন্দে যতি ভাঙালে॥
শীর্ণা তনুর মোর তটিনীতে কেন
আনিলে ফেনিল জল-উচ্ছাস হেন,
পাতাল-তলের ক্ষুধা মাতাল এ যৌবন
মদির-পরশে কেন জাগালে॥

কৃষ্ণা॥ ও কুৎসিত নারীকে এখনি তাড়াও এখান থেকে! ও কে তোমার?

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) তুমি যে পাপের মিথ্যার কথার

কথা বল্‌ছিলে ও হচ্ছে তারই অপদেবতা। তোমাদের দেবতার মন্দির থেকে ফের্‌বার পথে ঐ অপদেবতাকে দেখ্‌লে ওকে নমস্কার কর্‌তে ভুলিনে কৃষ্ণা! ওর বাঁকা চোখ তোমার সত্যের সোজা চোখের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।

কৃষ্ণা॥ উঃ ভগবান্! (বসিয়া পড়িল)

মীনকেতু॥ (মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) তুমি মদালসা না বসন্তসেনা? ওরি একটা-কিছু হবে বুঝি? কিন্তু আজ অতিরিক্ত মদ খেয়েছ এবং অলসও যে হ'য়েচ তা চলা দেখেই বুঝেছি।

মদালসা॥ কি প্রাণ, আজ যে ফুরসৎই নেই? (কৃষ্ণাকে দেখে) একে আবার কোথা থেকে আমদানি কর্‌লে? আমরা কি চিরকালের জন্যে রপ্তানি হ'য়ে গেলুম? আচ্ছা, এ রাজ্যি থাক্‌বে না বেশিদিন। দেখি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও!

মীনকেতু। আহা রাগ করো কেন সুন্দরী, মাঝে মাঝে পুণ্য ক'রে পাপেরও মুখ বদ্‌লে নিতে হয়, এ সব পুণ্যাত্মারা যখন বাসি হ'য়ে উঠ্‌বেন তখন তোমারই দুয়ারে আবার যাব।

[মদালসার টলিতে টলিতে প্রস্থান

আলেয়া

[প্রধানা গায়িকা কাকলি ও সখীদের গান]

(গান)

কাকলি ও সখীরা ॥

ধর ধর ভর এ রঙীন পেয়ালী।
আঁধার এ নিশীথে জ্বালো জ্বালো দেয়ালী।
চাঁদিনী যবে মলিন প্রখর আলোকে
প্রদীপ নব জ্বালো গো চোখে,
নতুন নেশা লয়ে জাগো জাগো খেয়ালী ॥
ভোলো ভোলো রাতের স্বপন,
প্রভাতে আনো নব জীবন!
শতদলে আঁখি-জলে করো গোপন,
হায় বেদনা ভরে কার তরে
বৃথাই খেয়ালি ॥

মীনকেতু ॥ ঠিক সময় এসেছো তোমরা কাকলি। তোমার যৌবনের গান আর এদের যৌবনের প্রতীক্ষাই করছিলুম। এই ফুলফোটার গান শুনে বালিকা কিশোরী হয়, তরুণী যৌবন পায়, রাতের কুঁড়ি দিনের ফুল হ'য়ে হাসে, এই আমার রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত!

কবি ॥ ঠিক রাজ্যের নয় সম্রাট, এ আমাদের যৌবনের জাতীয় সঙ্গীত।

জলের ভাগই বোধ হয় বেশী ছিল—নেশাটা ক্রমেই পান্‌সে হ'য়ে আস্‌ছে। কই কবি, তোমার সেনাদল গেল কোথায় ?

(গান)

তরুণীরা ॥

আধো ধরণী-আলো আধো আঁধার॥
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার॥
আধো কঠিন ধরা, আধেক জল,
আধো মৃণাল কাঁটা আধো কমল,
আধো সুর আধো সুরা, বিরহ বিহার॥
আধো ব্যথিত বুকে আধেক আশা,
আধেক গোপন, আধেক ভাষা।
আধো ভালবাসা আধেক হেলা,
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত বেলা,
আধো রবির আলো আধো নীহার॥

[কবি ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

মীনকেতু॥ যাচ্ছি সম্রাট্! আকাশের দেবী ও মাটির মানুষে যখন নিরিবিলি দুটো কথা কওয়ার জন্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তখন সব চেয়ে মুস্কিল হয় ত্রিশঙ্কুর। লজ্জার দায় এড়াতে বেচারা স্বর্গেও উঠে যেতে পারে না, পৃথিবীতেও নেমে আস্‌তে পারে না!

[প্রস্থান

মীনকেতু॥ (চ'লে যেতে যেতে ফিরে এসে) যার আগে যাওয়ার কথা, সে-ই যে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা॥ আমি ভাবছি সম্রাট্, এই ফুল দ'লে চলার কি কোনো জবাবদিহি করতে হবে না কারুর কাছে? এর কি সত্যিই কোনো অপরাধ নেই?

মীনকেতু॥ নেই কৃষ্ণা, কোনো অপরাধ নেই। আর যদি থাকেই ত সে অপরাধ আমার নয়,—সে অপরাধ এই চলমান পায়ের, আমার দৃপ্ত গতিবেগের। এই হচ্ছে চিরচঞ্চল যৌবনের চিরকালের রীতি, এই অপরাধে যৌবন যুগে যুগে অপরাধী।

[প্রস্থান

কৃষ্ণা॥ (সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া) নির্ম্মম! দস্যু! (কৃতাঞ্জলিপুটে আকুল কণ্ঠে) তবুও তুমি সুন্দর—অপরূপ! কিন্তু একি! কান্নায় আমার বুক ভেঙে আস্‌ছে কেন? ও ত আমার হৃদয়ের কেউ নয়, শুধু এই রাজ্যের রাজা! আমিও ওর কেউ নই। ও সম্রাট্, আমি মন্ত্রী। তবু—এমন করে কেন? উঃ! এ কোন্ মায়ামৃগ আমায় ছলনা করতে এল? (মাটিতে লুটাইয়া পড়িল)

[কাকলি আসিয়া নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কাকলি গান করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণা উঠিয়া বসিল।]

(গান)

কাকলি ॥

আঁধার রাতে কে গো একেলা।
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা ॥
কি দুখে আজি যোগিনী-সাজি'
আপনারে লয়ে এ হেলা ফেলা ॥
সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।
ফেলিয়া ধূলায় দিও না গো তায়
সাধিছে নূপুর চরণ ধরে।
কাঁদিয়া কারে খোঁজ' ওপারে
আজও যে তোমার প্রভাত বেলা ॥

কৃষ্ণা ॥ দেখেছিস্ কাকলি, এই তার দৃপ্ত পদরেখা। (পথ হইতে একটি পদদলিত রাঙা গোলাব তুলিয়া লইয়া) এই তার পায়ে-দলা রক্ত গোলাব, এমনি ক'রে ফুল আর হৃদয় দ'লে সে তার পায়ের তলার পথ রক্ত-রাঙা ক'রে চ'লে যায়।

কাকলি ॥ কেন ভাই আলেয়ার পিছনে ঘু'রে মর্‌ছ? হৃদয় দ'লে চলাই যার ধর্ম্ম, কেন—

কৃষ্ণা ॥ তুই ভুল বুঝেছিস্ কাকলি! আমি ওর কথা ভেবে কষ্ট পাই নারী ব'লে। বন্ধু ব'লে। তবু ও আলেয়া কেন

যেন কেবলি টান্‌তে থাকে। আমি প্রাণপণে বাধা দিই। মাঝে মাঝে হয়ত মনে হয়, ওই মিথ্যার পেছনে ঘোরার চেয়ে বুঝি বড় আনন্দ আমার জীবনে আর নেই। হৃদয়ের না হ'লেও ও ত শৈশবে বন্ধু ছিল।...আচ্ছা কাকলি, তুই যে গান গাইলি এ কার কাছে শিখেছিস্?

কাকলি॥ কবি মধুশ্রবার কাছে।

কৃষ্ণা॥ কবি মধুশ্রবা! এমন চোখের জলের গান সে লিখলে? সে যে আনন্দের পাখী, সে ত দুঃখ-বেদনাকে স্বীকারই করে না! সবাই দেখছি তাহ'লে আলেয়ার পেছনে ঘুর্‌ছে!

কাকলি॥ এ কথা আমিও কবিকে বলেছিলুম। সে হেসে বল্‌লে, কাঁটার মুখে যে ফুলের সার্থকতা আমি তাকেই দেখি, আমার বুকের তারগুলো ব্যথায় অত টন্‌টন্ ক'রে ওঠে ব'লেই ত হাতে এমন বীণা বাজে।

কৃষ্ণা॥ (চিন্তিত হইয়া) হুঁ, আমি বুঝেছি কাকলি। কবি একদিন কেমন ক'রে যেন আমার দিকে চায় (একটু ভাবিয়া) কিন্তু সে তার কথার ঝড়ে মনের মেঘকে কেবলই দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠেলে দেয়। ও-ই সব চেয়ে সুখী। কোনো কিছু দাবী করে না, কেবল দিয়েই ওর আনন্দ।

[চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

সেনাপতি, তুমি এখানে! তুমি সীমান্ত রক্ষা কর্‌তে যাওনি? কাকলি তুই চল্, আমি যাচ্ছি।

[কাকলির প্রস্থান

চন্দ্রকেতু ॥ তুমি কোন্ সীমান্ত রক্ষার কথা বল্‌ছ কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা ॥ তুমি কি জাননা, যশল্মীরের রাণী জয়ন্তী গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করেছে?

চন্দ্রকেতু ॥ জানি কৃষ্ণা, শুধু আক্রমণ নয়, আমাদের সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত ক'রে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের অপরাজেয় সেনাদল পরাজিত হ'ল একজন নারীর হাতে? আর তা জেনেও তুমি আজও রাজধানীতে ব'সে আছ?

চন্দ্রকেতু ॥ আমার কর্ত্তব্য আমি জানি কৃষ্ণা। নারীর বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিনে। আমার সহকারী সেনাপতিকে পাঠিয়েছি, শুনছি সে-ও নাকি পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা ॥ আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, আমি জান্‌তে চাই সেনাপতি, আমাদের অপরাজেয় সেনাদলের এই সর্ব্বপ্রথম পরাজয়ের লজ্জা কার? কে এর জন্য দায়ী?

চন্দ্রকেতু ॥ তুমি।

কৃষ্ণা ॥ আমি!

চন্দ্রকেতু ॥ হাঁ তুমি! (ব্যথাক্লিষ্ট কণ্ঠে) আমি কোন্ সীমান্ত রক্ষা কর্‌ব কৃষ্ণা! জয়ন্তী গান্ধার সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত আক্রমণ করেছে, সে আক্রমণ প্রতিরোধ কর্‌তে কতটুকু শক্তির প্রয়োজন? কিন্তু এ হৃদয়ের পূর্ব্ব সীমান্ত যে আক্রমণ করেছে তার সাথে যে পারিনে।

কৃষ্ণা ॥ (দৃপ্ত কণ্ঠে) সেনাপতি, আমি শুধু কৃষ্ণা নই, আমি এ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

চন্দ্রকেতু ॥ জানি কৃষ্ণা! তুমি যখন রাজসভায় প্রধান মন্ত্রীর আসনে বস, তখন তোমায় অভিবাদন করি, কিন্তু যে তার অন্তরের বেদনার ভারে এই পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে, তার নাম হতভাগিনী কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা ॥ (চমকিত হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে) চন্দ্রকেতু, বন্ধু!

চন্দ্রকেতু ॥ (আকুল কণ্ঠে) ডাক কৃষ্ণা, সেনাপতি নয়, বন্ধু নয়, শুধু আমার নাম ধ'রে ডাক। তোমার মুখে আমার নাম যেন কত যুগ পরে শুন্‌লুম। আঃ! নিজের নামও নিজের কানে এমন মিষ্টি শুনায়। এম্‌নি ক'রে কৈশোরে তুমি আমার নাম ধ'রে ডাক্‌তে, আর আমার রক্তে যেন আগুন ধ'রে যেত।

কৃষ্ণা ॥ (ম্লান হাসি হাসিয়া) আজো তোমার মনে আছে সে কথা? আমারও মনে পড়ে চন্দ্রকেতু, একদিন তুমি,

আমি আর মীনকেতু এই প্রমোদ উদ্যানের পথে এক সাথে খেলা করেছি, তখনো রাজার সিংহাসন আর রাজ্যের দায়িত্ব এসে আমাদের আড়াল ক'রে দাঁড়ায়নি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তখন কে জান্‌ত, এই পথেই আমাদের নূতন ক'রে খেলা শুরু হবে। (একটু ভাবিয়া হাসিয়া) আমি মীনকেতুর পাশে ব'সে তাকে বল্‌তাম, তুমি রাজা, আমি রাণী, ফিরে দেখ্‌তাম তুমি ম্লান মুখে চ'লে যাচ্ছ, আমার চাঁদ্‌নী রাত যেন বাদ্‌লা মেঘে ছেয়ে ফেল্‌ত।

চন্দ্রকেতু॥ সত্য বল্‌ছ কৃষ্ণা ? আমার অশ্রু তোমার চাঁদনী রাতকে মলিন করেছে কোনোদিন তাহ'লে ?

কৃষ্ণা॥ করেছে বন্ধু ! তুমি আমার বুকে মাধবী রাতের পূর্ণ চাঁদের রূপে উদয় হওনি কোনোদিন, কিন্তু চোখে বাদল রাতের বর্ষাধারা হ'য়ে নেমেছ !

চন্দ্রকেতু॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে) ধন্যবাদ কৃষ্ণা! কিন্তু তোমার এও হয়ত মনে আছে যে, আমি শৈশবের সে খেলায় বারবার ম্লানমুখে ফিরে আসিনি ! একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলুম, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার মীনকেতুর বিরুদ্ধে। তোমায় জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলুম। মীনকেতু যুদ্ধ করলে, কিন্তু আমার হাতে পরাজিত হ'ল। বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হ'য়ে তোমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তুমি কাঁদ্‌ছ। বুঝ্‌লুম, তুমি

বিজয়ীকে চাওনা—তুমি চাও তাকেই যার কাছে তুমি পরাজিতা লাঞ্ছিতা। তোমায় ফিরিয়ে দিলুম তোমার রাজার হাতে!

কৃষ্ণা॥ তুমি ভুল করেছ চন্দ্রকেতু! হয়ত সবাই এই ভুল করে। আমি মানি, মীনকেতুকে আমার ভালো লাগে। কিন্তু সে ভালো লাগা ভালোবাসা নয়। সিংহ দেখ্‌লে যেমন আনন্দ হয়, ভয় হয়, এও তেম্‌নি। কিন্তু সে কথা থাক্‌, সেদিন তোমার হাতে পরাজিত হ'য়ে মীনকেতু কি বলেছিল, মনে আছে? সে হেসে বলেছিল, 'বন্ধু, আমি যদি কৃষ্ণাকে তোমার মত ক'রে চাইতুম, তাহ'লে আমিও তোমায় এম্‌নি ক'রে পরাজিত কর্‌তুম। যাকে চাইনে তার জন্যে যুদ্ধ কর্‌তে শক্তি আস্‌বে কোত্থেকে।' সে আরো বলেছিল, 'চন্দ্রকেতু, আমি যদি সম্রাট্‌ হই, তোমাকে আমার সেনাপতি কর্‌ব।'

চন্দ্রকেতু॥ সেনাপতি আমায় সে করে নি, আমি আমার শক্তিতে সেনাপতি হয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণা, কি নিষ্ঠুর তুমি, ও-কথাগুলো তোমার মনে না করিয়ে দিলেও ত চল্‌ত।

কৃষ্ণা॥ দুঃখ কোরো না বন্ধু, তোমায় বুকের প্রেম দিতে পারিনি বলেই ত চোখের জল দিই। আমি নারী, আমি জানি, হৃদয়হীনতা দিয়ে হৃদয়কে যত আকর্ষণ করা যায়, তার

অর্দ্ধেকও হয়তো ভালোবাসা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় না। আমি ভালোবাসা পাইনি, তুমিও ভালোবাসা পাওনি—এইখানেই ত আমরা বন্ধু! কিন্তু তুমি ত আমার চেয়েও ভাগ্যবান্। আমি যে কাউকে ভালোবাস্‌তেই পার্‌লুম না। তুমি ত তবু একজনকে ভালবাস্‌তে পেরেছ!

চন্দ্রকেতু॥ দোহাই কৃষ্ণা, বন্ধু বোলো না! বোলো না। আমি চাই না তোমার কাছে ঐটুকু। বন্ধু মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে, হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না! (হাত ধরিয়া) কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা॥ (ধীরে হাত ছাড়াইয়া) কিন্তু তা ত হয় না চন্দ্রকেতু!

[গান করিতে করিতে কাকলির প্রবেশ]

(গান)

কাকলি॥

যৌবনে যোগিনী আর কতকাল
রবি অভিমানিনী।
ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধু যামিনী॥
লয়ে ফুল ডালি এল বনমালি,
জ্বালিল আকাশ তারার দীপালি,
ভাঙিল না ধ্যান মন্দির-বাসিনী॥

কৃষ্ণা॥ আমি চল্‌লুম, রাজসভায় যাওয়ার সময় হ'ল, পথ ছেড়ে দাও!

চন্দ্রকেতু ॥ আমি কোনো দিনই তোমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াইনি কৃষ্ণা! আজো দাঁড়াব না। আমি চিরকালের জন্যে তোমার পথ থেকে স'রে যাব। কিন্তু যাবার আগে আমার শেষ কথা ব'লে যাব।

কৃষ্ণা ॥ কাকলি, তুই চল্, আমি যাচ্ছি।

[কাকলির প্রস্থান

চন্দ্রকেতু ॥ তুমি জান কৃষ্ণা, আমি জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হইনি। একদিন শৈশবে যেমন জোর ক'রে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলুম, ইচ্ছা কর্‌লে আজো তেম্‌নি ক'রে ছিনিয়ে নিতে পারি। আমার হাতে সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু তরবারী আছে, বাহুতে শক্তি আছে—কিন্তু না—তা নেব না। তোমাকে জয় ক'রেই নেব।

কৃষ্ণা ॥ যুদ্ধ-জয় আর হৃদয়-জয় সমান সহজ নয় সেনাপতি।

চন্দ্রকেতু ॥ বেশ কৃষ্ণা, আমিও না-হয় হৃদয়ের ওই রাঙা রণভূমে পরাজিত হ'য়েই লুটিয়ে পড়্‌ব! কিন্তু সেই পরাজয়ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধজয়। আমি যেমন ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছি তুমিও সেদিন পরাজিত-আমার বিদায়-পথের ধূলায়—লুটিয়ে পড়্‌বে; কিন্তু সেদিন আমি তোমারই মত উপেক্ষা ক'রে চ'লে যাব নিরুদ্দেশের পথে।

[প্রস্থান

কৃষ্ণা ॥ (মূঢ়ের মত সেইদিকে তাকাইয়া আকুল কণ্ঠে) কে আমার নাম রেখেছিল কৃষ্ণা ? কৃষ্ণা নিশিথিনীর মতই আমার এক প্রান্তে সূর্য্যাস্ত, আর এক প্রান্তে পূর্ণ চাঁদের উদয় ! না ! না ! সূর্য্যাস্ত কখন হ'ল ?—এ কি বল্‌ছি ?

[রাজসভার সাজে সজ্জিত হইয়া মীনকেতুর প্রবেশ]

মীনকেতু ॥ সত্যি কৃষ্ণা, কুহেলিকারও একটা আকর্ষণ আছে ! আমি রাজসভায় যাচ্ছিলুম, যেতে যেতে তোমার ম্লানমুখ মনে পড়্‌ল। মনে হ'ল, এখনো তুমি তেমনি ক'রে ব'সে আছ। রাজসভা আজ এখানেই আহ্বান কর। সভাসদগণকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

[অভিবাদন করিয়া কৃষ্ণার প্রস্থান ও রঙ্গনাথের প্রবেশ]

মীনকেতু ॥ এস, এস রঙ্গনাথ, বড় একা একা ঠেক্‌ছিল। তুমি বোধ হয় শুনেছ, আমি আমার এ প্রমোদ-কাননেই আজ রাজসভা আহ্বান করেছি। (হঠাৎ চমকিত হইয়া রুক্ষস্বরে) কিন্তু ওকি রঙ্গনাথ, তুমি আবার দাড়ি রাখ্‌তে শুরু করেছ ? জান আমার আদেশ, কেউ দাড়ি রাখ্‌লে তাকে কি দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হয় ? ও কুশ্রী জিনিষটা রূপকে কলঙ্কিত করে, যৌবনের সভায় ওর স্থান নেই।

রঙ্গনাথ ॥ জানি সম্রাট্‌ দাড়ি রাখ্‌তে চাইলে আমার দেহ আর মাথাটাকে ধ'রে রাখতে পার্‌ব না। কিন্তু চাঁদের

কলঙ্কের মত দাড়িতে কি মুখের জৌলুস বাড়ে না সম্রাট? তা ছাড়া কি করি বলুন, আমি ত দাড়ি চাইনে, কিন্তু দাড়ি যে আমায় চায়। ও বুঝি আমার আর-জন্মের পরিত্যক্তা কালো বউ ছিল, তাই এজন্মে দাড়ি রূপে এসে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিছুতেই গাল ছাড়্‌তে চায় না, যত দূর ক'রে দিই তত সে আঁকড়ে ধরে। তা ছাড়া, সম্রাট্, আমরা কামাব দাড়ি আর নাপিত কামাবে পয়সা—এও ত আর সহ্য কর্‌তে পারিনে!

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) আচ্ছা, এবার থেকে আমরা নরসুন্দরকে ব'লে দেব, তোমার কাছে সে পয়সা কামাবে না, দাড়িই কামাবে।

রঙ্গনাথ॥ দোহাই সম্রাট্! পয়সা কামিয়েই ওরা দাড়ির চেয়ে গালই কামায় বেশী, কিন্তু বিনি-পয়সায় কামান হ'লে হয়ত গলাটাই কামিয়ে দেবে! আর কৃপা ক'রে যদি পাঠানই, তবে নরসুন্দরকে না পাঠিয়ে ক্ষুরসুন্দর কাউকে পাঠাবেন। ওর ক্ষুর তো নয় যেন খুর্‌পো! সম্রাট্ একটা গান শুন্‌বেন? গানটা অবশ্য আমার স্ত্রী রচনা করেছেন।

মীনকেতু॥ (উচ্চ হাস্য করিয়া) তোমার স্ত্রীর গান? তাতে আবার তোমার দাড়ি নিয়ে? গাও, গাও—ও চমৎকার হবে।

রঙ্গনাথ ॥ সে ত গান নয় সম্রাট্‌,—সে স্থধু নাকের জল চোখের জল ! আমার বড় দাড়ির অত্যাচার তার সয়েছিল, কিন্তু কামান দাড়ির খোঁচানী আর সইতে না পেরে বেদনার আনন্দে কবি হ'য়ে গানই লিখে ফেল্‌লে !

(গান)

খুঁচি খুঁচি স্থচি-সারি
হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি
যেন কণ্টক বৈঁচির বনে
কলি ও বন্দিনীগণের প্রস্থান
তারে ছাড়াতে বসন ছিঁড়ে
দেয় ভঙ্গ রণে ক্ষুর খুরপো হ
তারে কাট্‌তে—পালায় মাঠে মাদের সীমান্ত-রক্ষী
সে যে আঁধার বাদাড়-বন শ্মশ্রু দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
পাশে গুল্মলতার ঝাড় কণ্টকের গতিরোধ করতে
(শ্যামের দাড়ি রে—) চ্ছ।
শয়নে যাইতে মোর নয়ন ঝুরে লো সই অর্দ্ধেক লজ্জা
অঙ্গ কাঁপিয়া মরে ডরে। (সখি লো) লন করলে
ও যে মুখ নয়, পিতামহ ভীষ্ম শুইয়া যেন
খর শর শয্যার পরে! (সখি লো)
শজারুর সনে নিতি লড়াই
যাই রে দাড়ির বালাই যাই !

শ্যামের দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল যে গো ভালো

ছিল না খোঁচার জ্বালা

আমায় দাড়ির আঙুল বুলায়ে বুলায়ে

ঘুম পাড়াইত কালা।

আমার আবেশে নয়ন মুদে যে যেত !

সে পরশে নয়ন বু'জে যে যেত !

আমি খড়ের পালুই ধ'রে শুইতাম যেন গো,

সত্র. তাহে শীত নিবারিত, তারে কাটিল সে কেন গো !

এও ত আম র মুখের মতন কে দিল এমন

মীনকেতু॥ গড়ীরূপী মুড়ো ঝাঁ্যাটা গো,

নরসুন্দরকে ব'লে দেব ড়ায়ে কিল্‌বিল্ করে

দাড়িই কামাবে। । সতীন-কাঁটা গো।

রঙ্গনাথ॥ দোহাই যে ম'লাম

দাড়ির চেয়ে গালই কা র ধর জ্ব'লে যে ম'লাম॥

হ'লে হয়ত গলাটাই তু, কাকলি. বন্দিনীগণ, ছত্রধারিণী, করঙ্কবাহীগণ

পাঠানই, তবে ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ]

পাঠাবেন! ও বন্দিনীগণ॥

গান শুন'

(গান)

জাগো যুবতী! আসে যুবরাজ।

অশোক-রাঙা বসনে সাজ॥

আলেয়া

আসন পাতো বনে অঞ্চল আধ,
বন্দনা-গীতি—ভাষা বাধো বাধো,
কপোলে লাজ ॥
উছলি' ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে বুকে অঙ্গে
আকুল তরঙ্গে ॥
আগমনী-ছন্দে মেঘ-মৃদঙ্গে,
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে।
বাজো হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরী বাজো ॥

[কাকলি ও বন্দিনীগণের প্রস্থান

চন্দ্রকেতু ॥ সম্রাট্, জয়ন্তী আমাদের সীমান্ত-রক্ষী সেনাদলকে পরাজিত ক'রে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার সহকারী সেনাপতিকে তার গতিরোধ কর্‌তে পাঠিয়েছি। শুন্‌ছি সে-ও পরাজিত হয়েছে।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু আমাদের এ পরাজয়ের অর্দ্ধেক লজ্জা তোমার, সেনাপতি! তুমি নিজে সৈন্য পরিচালন কর্‌লে কখনো আমাদের এ পরাজয় ঘট্‌ত না।

চন্দ্রকেতু ॥ তা জানি, কিন্তু আমি নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিনে।

মধুশ্রবা ॥ তুমি জাননা সেনাপতি, সব নারী—নারী নয়। শৌর্যশালিনী নারীর পরাক্রম যে-কোনো পরাক্রমশালী পুরুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর। নদীর জল তরল স্বচ্ছ, কিন্তু সেই জল যখন বন্যার ধারারূপে ছুটে আসে, তখন তার মুখে ঐরাবতও ভেসে যায়।

রঙ্গনাথ ॥ (অন্যদিকে তাকাইয়া) ঠিক বলেছ বাবা, মদ্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা। সেনাপতি যদি একবার আমার স্ত্রীকে দেখ্‌তেন, তাহ'লে বুঝ্‌তেন, কেন মায়ের নাম মহিষ-মর্দ্দিনী!

মীনকেতু ॥ এই কি সেই যশল্মীরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্যেশ্বরের কন্যা সেনাপতি? কিন্তু আমি ত শুনেছিলুম সে উন্মাদিনী। দিবারাত্র নাকি সে রাজস্থানের মরুভূমিতে ঘূর্ণী-বায়ুর সাথে নৃত্য ক'রে ফেরে। ওর নাম ওদেশে মরুনটী।

চন্দ্রকেতু ॥ হাঁ সম্রাট্, এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী। মরুভূমির দুরন্ত বেদে ও বেদেনীর দল এর সহচর সহচরী, সেনাসামন্ত—সব। এদের নিয়ে সে মরু-ঝঞ্ঝার মত পর্ব্বতে প্রান্তরে নৃত্য ক'রে ফেরে।

[অধোমুখে সহকারী সেনাপতির প্রবেশ]

একি? সহকারী সেনাপতি? তুমি তাহ'লে সত্যই পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছ?

সহ-সেনাপতি ॥ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় সম্রাট্, কিন্তু ও মায়াবিনী। কেমন ক'রে কি হ'ল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখ্‌লুম আমার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে যাচ্ছে। মনে হল, আমাদের ওপর দিয়ে একটা দাবানল ব'য়ে গেল! ও নারী নয় সম্রাট্, ও আগুনের শিখা? ওর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারে—এত শক্তি বুঝি পৃথিবীর কোনো সেনানীরই নেই। সেদিন প্রত্যুষে সে যখন রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল, মনে হল, সমস্ত আকাশে আগুন ধ'রে গেছে। আমি তার মুখ-চোখ কিছুই দেখতে পাইনি, তবু চোখ যেন ঝল্‌সে গেল। সহস্র-কিরণ দিনমণির মত তার সহস্র শিখা ফণা বিস্তার ক'রে এগিয়ে এল; আমরা ফুৎকারে উড়ে গেলুম।

মীনকেতু ॥ তোমায় সে বন্দী কর্‌লে না সেনানী?

সহ-সেনাপতি ॥ না সম্রাট্। আমি তখনো অচেতন অবস্থায় পড়েছিলুম। হঠাৎ কিসের মাতাল করা সৌরভে আমার জ্ঞান ফিরে পেলুম। দেখ্‌লুম, সেই বিজয়িনী নারী আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। ভয়ে আমার চক্ষু আপনি মুদে এল। আমি তার দিকে তাকাতে পার্‌লুম না। সে আমায় বল্‌লে তোমায় বন্দী কর্‌ব না সেনাপতি, তোমার—তোমার সম্রাটকে বন্দী কর্‌তে এসেছি।

মীনকেতু ॥ (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) কি বল্‌লে সেনানী! আমাকে সে বন্দী কর্‌তে এসেছে ? (সিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়া) মন্ত্রী, সেনাপতি, চিনেছি,—চিনেছি আমি এই নারীকে। এরই প্রতীক্ষায় আমার দুর্দ্দান্ত যৌবন কেবলি ফুল আর হৃদয় দ'লে তার চলার পথ তৈরী কর্‌ছিল। এরই আগমনের আশায় এত হৃদয়ের এত প্রেম নিবেদনকে অবহেলা ক'রে চলেছি। ও জয়ন্তী নয়, যশল্মীরের অধীশ্বরী নয়, ও মরুচারিণী-মায়াবিনী, চিরকালের চির-বিজয়িনী! সে তার প্রতি চরণ পাতে শুষ্ক মরুর বুকে মরুদ্যান রচনা ক'রে চলে, পাষাণের বুক ভেঙে অশ্রুর ঝর্ণাধারা বইয়ে দেয়, পাহাড়ের শুষ্ক হাড়ে নিত্য নূতন ফুল ফোটায়—এ সেই নারী। মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদগণ! আমার অপরাজেয় সৈন্যদলের এই প্রথম পরাজয়—নারীর হাতে, সুন্দরের হাতে, এ আমারই পরাজয়, তোমাদের সম্রাটের পরাজয়, যৌবনের রাজার পরাজয়। এখনই ঘোষণা ক'রে দাও, আমার সাম্রাজ্য জু'ড়ে উৎসব চলুক, আনন্দের সহস্র দীপালী জ্বলে উঠুক। ব'লে দাও, আজ তাদের রাজাকে পরাজিত ক'রে তাদের রাজলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে ? আমার এই রাজসভা এখনি উৎসব-প্রাঙ্গণে পরিণত হোক্। কবি, নিয়ে এস তোমার বেণু, বীণা, সুরা ও নর্ত্তকীর দল। আজ

যৌবনের এই প্রথম পরাজয়ের পরম ক্ষণকে বরণ করতে যেন হাসি, গান, আনন্দের এতটুকু কার্পণ্য না করি! কৃষ্ণা, তুমি অমন ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদের রাজ্যের বিজয়িনী রাজলক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা ক'রে আনার দায়িত্ব যে তোমারই! আনন্দ কর, আনন্দ কর!

সভাসদগণ॥ জয়, গান্ধার-সাম্রাজ্যের ভাবী রাজলক্ষ্মীর জয়!

কৃষ্ণা॥ মার্জ্জনা করবেন সম্রাট্। আমি যদি সত্যসত্যই এই সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হই, তাহ'লে আদেশ দিন, আমি সেই বিজয়িনীর গতিরোধ করব। আমি নারী, নারী কোন্ শক্তিতে যুদ্ধে জয়ী হয়, তা আমি জানি। ওর মায়ায় আপনার তরুণ সেনাপতিদের চোখ ঝল্‌সে যেতে পারে, তারা পরাজিত হতে পারে, ওরা পুরুষ, কিন্তু আমি তার এই অভিযানের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দান করব।

মীনকেতু॥ পারবে না কৃষ্ণা, পারবে না। যে নারী আমার সীমান্তের দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারের বাধাকে অতিক্রম ক'রে আমার চির-বিজয়ী সেনাদলকে এমন পরাস্ত করেছে, সে সামান্যা নারী নয়, সে চিরকালের বিজয়িনী।

কৃষ্ণা॥ সে যদি সম্রাটের মনের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর অতিক্রম ক'রে হৃদয়-সাম্রাজ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে ত সে

স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তবু সেই বিজয়িনীর সাথে আমার শক্তি-পরীক্ষার কোনো অধিকারই কি নেই সম্রাট্?

মীনকেতু॥ নিশ্চয় আছে, কৃষ্ণা। আমি আদেশ দিলুম, তুমি যেতে পার তার শক্তি পরীক্ষায়।

চন্দ্রকেতু॥ সেনাপতি জীবিত থাক্‌তে মন্ত্রীর সৈন্য পরিচালনার চেয়ে আমাদের বড় কলঙ্ক আর কি থাক্‌তে পারে সম্রাট্? মন্ত্রী রাজ্যই পরিচালনা করেন, সৈন্যচালনা করা সেনাপতির কাজ।

কৃষ্ণা॥ (সক্রোধে ও বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) চুপ কর সেনাপতি। তুমি আজ হীনবীর্য্য কাপুরুষ, তোমার শক্তি থাক্‌লে আমাদের অজেয় সেনাদলের এই হীন পরাজয় ঘট্‌ত না।

চন্দ্রকেতু॥ কাপুরুষই যদি হ'য়ে থাকি, সে অপরাধ আমি ছাড়া হয়ত আর-কারুর।

মীনকেতু॥ ঠিক বলেছ চন্দ্রকেতু। মাঝে মাঝে অটল পৌরুষের মহিমাও খর্ব্ব হয়, বিজয়ীর রথের চূড়ায় নীলাম্বরীর আঁচল দুলে ওঠে বলেই ত পৃথিবী আজো সুন্দর। তুমি যে কারণে কাপুরুষের আখ্যা পেলে, ঠিক সেই কারণেই হয়ত আমারও বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তরবারী ধারণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকেতু॥ আমি এখনো নিজেকে তত দুর্ব্বল মনে

করিনে সম্রাট্। যদি শক্তিই হারিয়ে থাকি, তাহ'লেও যে-শক্তি এখনো এই বাহুতে অবশিষ্ট আছে, পৃথিবী জয়ের জন্য সেই শক্তিকেই যথেষ্ট মনে করি। (প্রস্থানোদ্যত) আমি কি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি সম্রাট্?

মীনকেতু॥ না সেনাপতি। তুমি যে আমার দক্ষিণ হস্তের তরবারী। কিন্তু সেনাপতি, আজ যে আমারি তরবারী-মুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেছে, তুমি শক্তি পাবে কোত্থেকে? তুমি এতদিন অস্ত্রের যুদ্ধে, নর-সংগ্রামেই বিজয়ী হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের যুদ্ধে, নারীকে জয় করার সংগ্রামেও জয়ী হ'য়ে ফেরা—সে তোমার চেয়ে শতগুণে শক্তিধর বীরপুরুষেরাও পারেননি বন্ধু!

চন্দ্রকেতু॥ এ ত আমার হৃদয়-জয়ের অভিযান নয় সম্রাট্, এ অভিযান শুধু যুদ্ধ-জয়ের জন্য, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য।

মীনকেতু॥ (একবার কৃষ্ণা ও একবার চন্দ্রকেতুর দিকে তাকাইয়া চতুর হাসি হাসিয়া) এইখানেই ত রহস্য চন্দ্রকেতু। যেখানে আসল যুদ্ধ চলেছে সেনাপতির, সে রণক্ষেত্র ছেড়ে সে যদি এক শূন্যমাঠে গিয়ে তরবারী ঘোরায়, তাহ'লে তার জয়ের আশাটা বেশ একটু মহার্ঘ্য হ'য়ে পড়ে না কি?

চন্দ্রকেতু॥ আজ তারই পরীক্ষা হোক সম্রাট্। আমি দেখতে চাই সত্যই আমি শক্তি হারিয়েছি কি না। [প্রস্থান

কৃষ্ণা॥ আপনার আনন্দ-উৎসব চলুক সম্রাট্, আমি কৃষ্ণা—আলোক-সভার অন্তরালেই আমার চিরকালের স্থান।

[প্রস্থান

[সহসা আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল বৈশাখীর মেঘ দেখা দিল। ধূলায় শুক্‌নো পাতায় প্রমোদ-উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। মেঘের ঘন গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল।]

রঙ্গনাথ॥ (সভয়ে চীৎকার করিয়া) সম্রাট্! আকাশে দেবতাদের উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। অপ-দেবতার আয়োজন পণ্ড কর্‌তেই ব্যাটাদের এই কুমন্ত্রণা। বাবা, "যঃ পলায়তি স জীবতি"!

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) ভয় নেই রঙ্গনাথ! ঐ ঝড়ই আমার না-আসা বন্ধুর পদধ্বনি। শুন্‌ছ না—বজ্রে বজ্রে তার জয়ধ্বনি, কালবৈশাখীর মেঘে তার বিজয়-পতাকা? চল, প্রাসাদের অলিন্দে ব'সে আজ মেঘ-বাদলেরই নৃত্যোৎসব দেখি গিয়ে।

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে ঝোড়ো হাওয়া ও ঘূর্ণীর প্রবেশ]

ঝোড়ো-হাওয়া॥

(গান)

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝন ঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী কাঁদিছে
পড়ি' চরণে শন শন শন শন॥

দোলে ধূলি-গৈরিক নিশান গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জ্জটী সঘনে।
হর তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রণ রণ রণ রণ ॥
লীলা-সাথী তব নেচে চলি ঘূর্ণী।
বালুকার ঘাগরী, ঝরা পাতা উড়্নী ॥
আলুথালু শতদলে খোঁপা ফেলি টানি,
দিকে দিকে ঝর্ণার কুলুকুচু হানি।
সলিলে নুড়িতে চুড়ি পঁইচি বাজে
রিণিঝিনি রণঝন ॥

[গান করিতে করিতে ঝড় ও ঘূর্ণীর প্রস্থান

[মৃদঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে নটরাজের প্রবেশ]

নটরাজ ॥

(গান)

নাচিছে নটনাথ শঙ্কর মহাকাল।
লুটাইয়া পড়ে দিবারাত্রির বাঘ-ছাল,
আলো ছায়ার বাঘ-ছাল ॥
ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল।
দোলে ঈশান-মেঘে ধূর্জ্জটী-জটাজাল ॥

আলেয়া

বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে।
চরণ-আঘাত লেগে জাগে শ্মশানে কঙ্কাল ॥
সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা-তরঙ্গে
সঙ্গীত দু'লে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল ॥
সে নৃত্য-ঘোরে ধ্যান নিমীলিত ত্রি নয়ন
ধ্বংসের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জ্যোৎস্না-আশীষ ঝরে উছলিয়া শশী-থাল ॥

[নৃত্য ও গান করিতে করিতে বৃষ্টিধারার প্রবেশ]

বৃষ্টিধারা ॥

(গান)

নামিল বাদল
রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চল লো বাদল-পরী আকাশ-আঙিনা ভরি
নৃত্য-উছল ॥
চামেলী কদম যূথী মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে
তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে
চল্ ধরাতল ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ। চোখে মুখে অস্বাভাবিক ভীষণতা। কণ্ঠে, চলা-ফেরায়, ব্যবহারে বর্ব্বর বন্য পশুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বুকের তলা হইতে "বাঘনখ" অস্ত্র বাহির করিয়া সে এক মনে দেখিতে লাগিল। দূরে চন্দ্রিকার গান শুনিতেই উগ্রাদিত্য চমকিয়া উঠিল।]

[গান করিতে করিতে চন্দ্রিকার প্রবেশ)

চন্দ্রিকা ॥

(গান)

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখিজলে টলমল ॥
কোমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ॥
ডুবেছি অতল জলে কত যে জ্বালা স'য়ে
শত ব্যথা ক্ষত ল'য়ে হইয়াছি শতদল ॥
আমার বুকের কাঁদন, তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস,
দখিণা বায়ু চপল ॥

চন্দ্রিকা ॥ এ কি, সেনাপতি। লুকিয়ে আমার গান শুন্‌ছিলে বুঝি ?

উগ্রাদিত্য॥ (কর্কশ কণ্ঠে মুখ বিকৃত করিয়া) আমি গান কারুরই শুনিনে চন্দ্রিকা। আমি গাধার চীৎকার দশ ঘণ্টা ধ'রে শুন্‌তে পারি কিন্তু মানুষের চীৎকার—হ্যাঁ চীৎকার বই কি, তা তোমরা তাকে হয়ত গান ব'লে থাক—এক মুহূর্ত্তও শুন্‌তে পারিনে।

চন্দ্রিকা॥ বল কি উগ্রাদিত্য! গান হ'ল চীৎকার? আর গাধার ডাক হ'ল তোমার কাছে মানুষের—মানে আমার গানের চেয়েও সুন্দর? হলই-বা ওরা তোমার আত্মীয়, তাই ব'লে কি এতটা পক্ষপাত কর্‌তে হয়?

উগ্রাদিত্য॥ দেখ চন্দ্রিকা, তুমি যে কি সব কথা বল প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে, আমি তার মানে বুঝি না, অবশ্য বুঝবার দরকারও নেই আমার। তোমার চলন বাঁকা, তোমার চোখের চাউনি বাঁকা, তোমার কথা বাঁকা!

চন্দ্রিকা॥ অর্থাৎ আমি অষ্টাবক্র মুনি, এই ত। (গান করিয়া) "বাঁকা শ্যাম হে, বাঁকা তুমি, বাঁকা তোমার মন।"

উগ্রাদিত্য॥ উঃ, মানুষের কত বেশী মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘট্‌লে এমন সুর ক'রে চ্যাঁচাতে পারে।একরোখা চ্যাঁচানোর মানে বুঝি, তা সওয়া যায়, কিন্তু এই একবার জোরে, একবার আস্তে, একবার নাকি সুরে চ্যাঁচানো শুনে এমন রাগ ধরে!

চন্দ্রিকা॥ এও আবার লোকে আদর ক'রে শোনে! এত

পাগলও আছে পৃথিবীতে! ভাগ্যিস্ তোমার মত আরো দু-চারটি পাথুরে-মস্তিষ্কের লোক নেই পৃথিবীতে, নইলে পৃথিবীটা, এতদিন চিড়িয়াখানা হ'য়ে উঠ্ত উগ্রাদিত্য!—(চমকিয়া) ওকি! তুমি অমন ক'রে বাঘ-নখ ধরেছ কেন? তোমার চোখে হিংস্র বাঘের মত অমন দৃষ্টি কেন? সাপ যেমন ক'রে শিকারের দিকে তাকায়,—না আমার কেমন ভয় কর্‌ছে। আমি পালাই!

[ছুটিয়া পলাইল

[চন্দ্রিকার হাত ধরিয়া জয়ন্তীর প্রবেশ]

জয়ন্তী॥ কি রে, তুই অমন ক'রে ছুট্‌ছিলি কেন? ভূত দেখ্‌লি নাকি?

চন্দ্রিকা॥ (ভয়-জড়িত কণ্ঠে) হাঁ! না দিদি, ভূত নয়, বাঘ! নেক্‌ড়ে বাঘ!

জয়ন্তী॥ বাঘ? কোথায় দেখ্‌লি?

চন্দ্রিকা॥ (উগ্রাদিত্যকে দেখাইয়া) ঐ দাঁড়িয়ে! হালুম! ঐ দেখ, হাতে বাঘ-নখ! বাঘের মত গোঁফ, চোখ, মুখ, শুধু ল্যাজটা হলেই ও পুরোপুরি বাঘ হ'য়ে যেত!

জয়ন্তী॥ তুই বড় দুষ্টু চন্দ্রিকা! ওর পেছনে দিনরাত অমন ক'রে ফেউ-লাগা হ'য়ে লেগে থাকলে ও তাড়া করবে না?

চন্দ্রিকা ॥ কেউ কি সাধে লাগে দিদি? কেউ ডাকে বলেই ত দেশের শিকারগুলো এখনও বেঁচে আছে। নইলে তোমার বাঘ এতদিন দেশ সাবাড় ক'রে ফেলত!

জয়ন্তী ॥ কিন্তু, ও ত আমার কাছে দিব্যি শান্ত হ'য়ে থাকে। ঐ দেখ্‌না ওর বাঘ নখ ওর বুকের ভিতর নিয়ে লুকিয়েছে!

চন্দ্রিকা ॥ কি জানি দিদি, ঘোড়ার লাথি ঘোড়াই সইতে পারে! ও তোমার পোষা বাঘ কিনা!

জয়ন্তী ॥ উগ্রাদিত্য!

উগ্রাদিত্য ॥ (তরবারী-মুষ্টি ললাটে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল)

জয়ন্তী। (চন্দ্রিকার দিকে তাকাইয়া) দেখলি চন্দ্রিকা, ও আজও আমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে অভিবাদন করলে না। ললাটে তরবারী ছুঁইয়ে সম্মান দেখালে। ও বলে, ওর শির ভূমিস্পর্শ কর্‌তে পারে শুধু তারি খড়্গে যে ওকে পরাজিত কর্‌বে।

চন্দ্রিকা ॥ সে মহাষ্টমী কখন আস্‌বে দিদি! আমার বড্ডো সাধ, মহিষ-মর্দ্দিনীর পায়ে মহিষ-বলি দেখ্‌ব!

জয়ন্তী ॥ ছি চন্দ্রিকা! তুই বড্ডো প্রগল্‌ভা হয়েছিস্‌! উগ্রাদিত্য, তুমি এখন যাও, আমি দরকার হ'লে ডাক্‌ব।

আর দেখ, চন্দ্রিকার উপর রাগ কোরো না। মনে রেখো, ও আমারই ছোট বোন!

উগ্রাদিত্য॥ জানি রাণী! (আবার ললাটে তরবারী ছোঁয়াইয়া অভিবাদন করিয়া চন্দ্রিকার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া গেল।)

জয়ন্তী॥ আচ্ছা চন্দ্রিকা! এই যে ওকে রাতদিন অমন ক'রে ক্ষেপাস্, ধর্ ওরই সাথে যদি তোর বিয়ে হয়!

চন্দ্রিকা॥ বাঃ, দিদির চমৎকার পছন্দ ত! এ মুক্তোর মালা অম্‌নি জীবের গলায়ই ত ঠিক্-ঠিক মানাবে!....আচ্ছা দিদি, ও অত নিষ্ঠুর কেন! যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি, ও আহত সৈনিককেও হত্যা কর্‌তে ছাড়ে না! ও যেন বনের পশু। আদিমকালের বর্ব্বর!

জয়ন্তী॥ ও সত্যই মৃত্যুর মত মমতাহীন। তাই ও জ্যান্ত আহত কারুর প্রতি কোনো মমতা দেখায় না। মারতে হবে—এইটাই ওর কাছে সত্য। ঐ হচ্ছে পরিপূর্ণ পুরুষ, চন্দ্রিকা! ওর মাঝে একবিন্দু মায়া নেই, করুণা নেই! ওর এক তিলও নারী নয়!—পশু, বর্ব্বর, নির্ম্মম পৌরুষ!

চন্দ্রিকা॥ (হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গান করিতে লাগিল)

(গান)

বেসুর বীণার ব্যথার সুরে বাঁধ্‌ব গো।
পাষাণ বুকে নির্ঝর হ'য়ে কাঁদ্‌ব গো॥

কু'লের কাঁটায় স্বর্ণলতার তুল্‌ব হার,
ফণীর ডেরায় কেয়ার কানন ফাঁদ্‌ব গো ॥
ব্যাধের হাতে শুন্‌বো সাধের বংশী-স্বর,
আস্‌লে মরণ চরণ ধ'রে সাধ্‌ব গো ॥
বাদল ঝড়ে জ্বাল্‌ব দীপ বিদ্যুৎলতার,
প্রলয় জটায় চাঁদের বাঁধন ছাঁদব গো ॥

জয়ন্তী ॥ আচ্ছা চন্দ্রিকা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি, ওর ওপর তোর এত আক্রোশ কেন? ওকে দেখ্‌তেও পারিস্‌নে আবার ভুল্‌তেও পারিস্‌নে। ঘৃণা করার ছলে যে ওকে নিয়েই তোর মন ভ'রে উঠ্‌লো?

চন্দ্রিকা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যিই ত দিদি. এমনি ক'রেই বুঝি সাপের ছোবলে সাপুড়ের, বাঘের হাতে শিকারীর মৃত্যু হয়। (একটু ভাবিয়া) তা ও-সাপ যদি নাচাতেই হয় আমাকে, ওর বিষ-দাঁতগুলো আগে ভেঙে দেবো!

জয়ন্তী ॥ ছি ছি, শেষে ঢোঁড়া নিয়ে ঘর কর্‌বি?

চন্দ্রিকা ॥ বিষ গেলে ওর কুলোপনা চক্র থাক্‌বে ত। ফোঁস্ ফোঁসানী থাক্‌লেই হ'ল, লোকে মনে কর্‌বে জাত-গোখরো। (চলিয়া যাইতে যাইতে) সত্যি দিদি. আমার দিনরাত কেবলি মনে হয় ও কেন অমন বন্যপশু হ'য়ে থাক্‌বে?

ওকে কি লোকালয়ের মানুষ ক'রে তোলার কেউ নেই? বড় দয়া হয় ওকে দেখ্‌লে। ও যেন সব চেয়ে নিরাশ্রয়, একা। ওর বন্ধু সাথী কেউ নেই! ঐ পাথুরে পৌরুষকে নারীত্বের ছোঁয়া দিয়ে মুক্তি দিলে হয়ত মহা-পুরুষ হ'য়ে উঠ্‌বে।

জয়ন্তী॥ হাঁ, দস্যু রত্নাকর হঠাৎ বাল্মীকি মুনি হ'য়ে উঠ্‌বেন!

চন্দ্রিকা॥ বিচিত্র কি দিদি! সত্যি, বল ত, কেন এমন হয়? ও কেন এমন বর্ব্বর হ'ল শুধু এই চিন্তাটাই আমাকে এমন পীড়া দেয়? ওকে কেন এমন ক'রে পীড়ন করি? বেচারা বুনো! (হাসিয়া উঠিয়া) এক এক বার এমন হাসি পায়! মনে হয় আমার সমস্ত শরীরটা দাঁত বের ক'রে হাসছে।

(গান)

তাহারে দেখ্‌লে হাসি, সে যে আমার দেখন-হাসি,
(ওগো) আমি কচি, সে যে ঝুনো, আমি উনিশ
সে উন-আশি॥
সে যে চিল আমি ফিঙে, আমি বঁটি সে যে ঝিঙে।
আমি খুশী সে যে খাসি, সে যে বাঁশ আমি বাঁশী।
ও সে যত রাগে, অনুরাগে পরাই গলে তত ফাঁসি॥

জয়ন্তী॥ তুই তোর বাঁদরের চিন্তা কর্। আমি চল্‌লুম, আমার অনেক কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যত।)

চন্দ্রিকা॥ আচ্ছা দিদি, আমি কি তোমার কোনো কিছু জানবার অধিকারী নই ? তোমার অনেক কাজ আছে বল্‌লে, কিন্তু ঐ অনেক কাজের একটা কাজেও ত সাহায্য করতে ডাক্‌লে না আমায়।

জয়ন্তী॥ (চন্দ্রিকার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) পাগল! সবাই কি সব কাজের উপযুক্ত হয়! তোর প্রতি পরমাণুটি নারী, তাই শুধু হৃদয়ের ব্যাপার নিয়েই মেতে আছিস্। আমার মধ্যে নারীত্ব যেমন, পৌরুষও তেমনি—তাই আমি এখন হাতে যেমন তরবারী ধরেছি, তেমনি—সময় এলে চোখে বাণও হয়ত মারব। তুই আগাগোড়া নারী ব'লেই এই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পশু উগ্রাদিত্যের এত চিন্তা করিস্! আর আমি অর্দ্ধ-নারী ব'লে পুরুষালি রাজ্যের চিন্তা নিয়ে মরি। তাই তুই হয়েছিস্ নারী, আর আমি হয়েছি রাণী!

চন্দ্রিকা॥ (রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) তুমি যা না তাই বল্‌ছ দিদি আমায়! আমার মরণ নেই তাই গেলুম ঐ বুনো জানোয়ারটাকে ভালোবাস্‌তে! আমি চল্‌লুম ফের তোমার বাঘকে খোঁচাতে।

[প্রস্থান

জয়ন্তী॥ ওরে যাস্‌নে! আঁচড়ে-কামড়ে দেবে হয়ত!....
(ঐ পথে চাহিয়া থাকিয়া) পাগল! বদ্ধ পাগল!

[উগ্রাদিত্যের প্রবেশ]

উগ্রাদিত্য ॥ আমার মনে ছিল না সম্রাজ্ঞী, আজ আমাদের অগ্নি-উৎসবের রাত্রি।

জয়ন্তী ॥ আমার মনে আছে সেনাপতি! কিন্তু এবার এ নৃত্যে যোগদান কর্‌ব শুধু আমি আর আমার যোগিনীদল। তুমি আমার সব সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঐ পার্ব্বত্য-গিরিপথ রক্ষা কর্‌বে! আমাদের এই উৎসবের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা যেন আমাদের আক্রমণ কর্‌তে না পারে।

[উগ্রাদিত্যের পূর্ব্বরূপ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান

জয়ন্তী ॥ কোথায় লো যোগিনীদল! আয়, আজ যে আমাদের অগ্নি-বাসর।

[গান করিতে করিতে অগ্নিশিখা রঙের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া
যোগিনীদলের প্রবেশ]

(গান)

যোগিনী দল ॥

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা!
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা॥
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,

জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী
বিশ্ব-দাহন-তেজে জাগো দাহিকা ॥
ধূ ধূ জ্ব'লে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি।
জাগো মাতা কন্যা বধূ জায়া ভগ্নি!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা!
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

জয়ন্তী ॥ আমি আগুন, তোরা সব আমার শিখা! আজ ফাল্গুন পূর্ণিমা—আমার জন্মদিন। আগুনের জন্মদিন। এম্‌নি ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রথম-নারীর বুকে প্রথম আগুন জ্বলেছিল। সে আগুন আজও নিব্‌ল না। কত ঘরবাড়ী বনকান্তার মরুভূমি হ'য়ে সে অগ্নিক্ষুধায় ইন্ধন হ'ল, তবু তার ক্ষুধা আর মিটল না। ও যেন পুরুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতির যুদ্ধ-ঘোষণার রক্ত-পতাকা। নরের বিরুদ্ধে নারীর নিদারুণ অভিমান জ্বালা।

(গান)

যোগিনী দল ॥

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটীকা ॥

জয়ন্তী ॥ হাঁ, মীনকেতু গর্ব্ব ক'রে ঘোষণা করেছিল, সে নিখিল পুরুষের প্রতীক। যৌবন-সাম্রাজ্যের সম্রাট্। ফুল আর হৃদয় দ'লে চলাই নাকি ওর ধর্ম্ম। ওকে আমি জানাতে চাই, যে, যৌবন শুধু পুরুষেরই নাই। ওদের যৌবন আসে ঝড়ের মত, তুফানের মত বেগে; নারীর যৌবন আসে অগ্নি-শিখার মত রক্তদীপ্তি নিয়ে। আমি জানাতে চাই, পুরুষের পৌরুষ-দুর্দ্দান্ত যৌবনকে যুগে যুগে নারীর যৌবনই নিয়ন্ত্রিত করেছে। নারীর হাতের লাঞ্ছনা-তিলকই ওদের নিরাভরণ রূপকে সুন্দর ক'রে অপরূপ ক'রে তুলেছে। মীনকেতু যদি হয় নিখিল পুরুষের প্রতীক, আমিও তাহ'লে নিখিল নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা—তার বিরুদ্ধে—নিখিল পুরুষের বিরুদ্ধে।

[যোগিনীগণের গান ও অগ্নিনৃত্য]

(গান)

যোগিনী দল ॥

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা—

[দূরে তূর্য্য-নিনাদ, সৈনিকদলের পদধ্বনি, জয়ধ্বনি ও গান]

জয়ন্তী। ঐ উগ্রাদিত্য চলেছে আমার অজেয় মরুসেনা নিয়ে। চল আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের জয়-যাত্রার ঐ অপরূপ শোভা দেখি গিয়ে। বিরাট-সুন্দকে দেখ্‌তে হ'লে দূর থেকেই দেখ্‌তে হয়, নইলে ওর পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে না।

[জয়ন্তী ও যোগিনীদলের প্রস্থান

[গান ও মার্চ্চ করিতে করিতে যশল্মীর-সেনাদলের প্রবেশ]

সেনাদল ॥

টলমল টলমল পদ ভরে—
বীরদল চলে সমরে ॥
খর-ধার তরবার কটিতে দোলে,
রনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য্য-রোলে শোক মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশীষ সূর্য্য সহস্র করে ॥
চলে শ্রান্ত দূর পথে
মরু দুর্গম পর্ব্বতে
চলে বন্ধু-বিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা!
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান,
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

[গান্ধার রাজ্যের প্রমোদ-প্রাসাদ। মধুশ্রবা, তরুণী কিশোরীর দল, রঙ্গনাথ, কাকলি প্রভৃতি আসীন। মীনকেতু তখনো আসেনি ; বৈতালিকের গান।]

বৈতালিক ॥

(গান)

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন মাঝে ॥
দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে
আকাশ-আঁখি চাহে মুখপানে,
দোলে ধরাতল দীপ-ঝলমল
নৌবতে ভূপালি বাজে ॥

(হাসিতে হাসিতে মীনকেতুর প্রবেশ। তরুণী ও কিশোরীদলের নৃত্য ও গান।]

তরুণী ও কিশোরীরা ॥

(গান)

মাধবী-তলে চল মাধবিকা দল
আইল সুখ-মধুমাস।
পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মধুপ মদালস পুষ্প-বিলাসে,
বেণু-বনে ব্যাকুল উছাস ॥

আলেয়া

তরুণ নয়ন সম আকাশ আ-নীল,
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে দীরঘ নিশাস ॥

(গীত শেষে কাকলি পরিপূর্ণ সুরার পাত্র আগাইয়া দিল)

মীনকেতু ॥ (সুরার পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া) শুধু সুরা নয় কাকলি, সুরার সঙ্গে সুর চাই। তোমার বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠের সুর। আজ যে আমার তাকেই দেখার দিন, যাকে কখনো দেখিনি।

কাকলি ॥

(গান)

গহীন রাতে—
ঘুম কে এলে ভাঙাতে ॥
ফুলহার পরায়ে গলে,
দিলে জল নয়ন-পাতে।
যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে ॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি,
নিশি আর নাহি বাকি
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ॥

[সাধারণ নাগরিকের শ্বেত বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তরবারীর শূন্য খাপ হস্তে সেনাপতি চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।]

মীনকেতু ॥ (উঠিয়া পড়িয়া) একি ! সেনাপতি ? শ্বেত পতাকা জড়িয়ে এসেছ বন্ধু !

চন্দ্রকেতু ॥ (মীনকেতুর পদতলে তরবারীর খাপ রাখিয়া) সম্রাট্ ! আমি আর সেনাপতি নই। আজ হ'তে আমার নাম শুধু চন্দ্রকেতু। আমার আর সেনাপতিত্ব কর্‌বার অধিকার নেই। আমি পরাজিত হয়েছি। পরাজিতের গ্লানি ভুলবার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তাই স্বেচ্ছায় আমি নিজেকে চির নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছি। আজ আর আমার মনে কোনো গ্লানি নাই, মৃত্যু-লোকের পথ রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি অমৃত-লোকের পথের দিশা পেয়েছি।

মীনকেতু ॥ জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি বন্ধু, তোমার এই অমৃত-লোকের পথের দিশারীটি কে ?

চন্দ্রকেতু ॥ আমার, না—একা আমার কেন—সর্ব্ব-

লোকের বিজয়িনী এক নারী। তার নাম আমি কর্‌ব না। আজ আমি সত্যই বুঝ্‌তে পেরেছি সম্রাট, হৃদয়ের রণভূমিতে যে জয়ী হয়, শত যুদ্ধজয়ের সেনাপতির চেয়েও সে বড়। হৃদয়-জয় কর্‌তে না পারার বেদনা আমার বাহুকে যে এমন শক্তিহীন ক রে তুল্‌বে, এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

মীনকেতু॥ (চন্দ্রকেতুর পিঠে চাপড়াইয়া) দুঃখ কোরো না বন্ধু, ও পরাজয়ের মধুর আস্বাদ একদিন তোমাদের মীন-কেতুকে—এই যৌবনের সম্রাটকেও পেতে হবে। সুন্দরের হাতের পরাজয় কি পরাজয়? কিন্তু সেই বিজয়িনীর কাছে তুমি পরাজিত হ'লে অস্ত্রের যুদ্ধে, না বিনা-অস্ত্রের যুদ্ধে?

চন্দ্রকেতু॥ (ম্লান হাসি হাসিয়া) দুই যুদ্ধেই সম্রাট, যদিও ওখানে বিনা-অস্ত্রের যুদ্ধ কর্‌তে যাইনি। আমার সৈন্য নিয়ে গৈরিকস্রাবের মত যশল্মীর-সৈন্যের উপর গিয়ে পড়লুম। প্রায় পরাজিতও ক'রে এনেছিলুম, এমন সময় আষাঢ়ের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত দীপ্তি নিয়ে এল জয়ন্তী—যশল্মীরের অধিশ্বরী। এত রূপ আমি আর দেখিনি। এইটুকু দেহের আধারে এত রূপ কি ক'রে ধর্‌ল, সকল রূপের স্রষ্টাই বল্‌তে পারেন। ও যেন বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু রূপের চেয়েও সুন্দর তার চোখ। ও-চোখে যেন সূর্য-চন্দ্র লুকোচুরি খেল্‌ছে!

মীনকেতু॥ বড় বাড়িয়ে বল্‌ছ চন্দ্রকেতু। তারপর কি হ'ল বল।

চন্দ্রকেতু॥ আমি তখনও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত। জয়ন্তী যেমন অপরূপ সুন্দর, উগ্রাদিত্য তেম্‌নি ভীষণ কুৎসিত। ওর শরীরে যেন সকল পশুর সকল দানবের শক্তি। ও যেন নিখিল অসুরের প্রতীক। বুঝ্‌লাম, দেবী-শক্তির সঙ্গে দানবশক্তি মিশেছে এসে। এ শক্তি অপরাজেয়।

মীনকেতু॥ (অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে করিতে) হ্যাঁ, এখন বুঝ্‌তে পেরেছি ওর শক্তির উৎস কোথায়।

চন্দ্রকেতু॥ হয়ত-বা উগ্রাদিত্যের হাতেই পরাজিত হতুম, কিন্তু সে লজ্জা থেকে বাঁচালে এসে জয়ন্তী। সে উগ্রাদিত্যেকে সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, 'তুমি ত এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পার্‌বে না সেনাপতি; তুমি ফিরে যাও।' আমি বল্‌লুম, 'আমি যুদ্ধস্থল থেকে কখনো পরাজয় নিয়ে ফিরিনি।' সে হেসে বল্‌লে, 'তুমি হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত। আহত সেনানীকে আমার সেনানীর আঘাত কর্‌তে বাধে না, কিন্তু আমার বাধে। তোমার চোখ ত সৈনিকের চোখ নয়, ও চোখে মৃত্যু-ক্ষুধা কই, ও যে প্রেমিকের চোখ, হতাশার

বেদনায় ম্লান।' আমি যেন এক মুহূর্ত্তে ঐ নারীর মনের আর্শিতে আমার সত্যকার আহত মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলাম! আমার হাত হ'তে তরবারি প'ড়ে গেল।

মীনকেতু॥ (অভিভূতের মত) হাঁ, এই সেই! এই সেই বিজয়িনী। আমার যেন মনে পড়্‌ছে স্বর্গে আমি ছিলুম পঞ্চশর, শিবের অভিশাপে এসেছি মর্ত্ত্যলোকে। ঐ বিজয়িনী, ও জয়ন্তী নয়, ও রতি! (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) তা নয়, তা নয়। হাঁ, তারপর, চন্দ্রকেতু, তুমি ফিরে এলে? ভ্রষ্ট তরবারী আবার কুড়িয়ে নিলে না?

চন্দ্রকেতু। ভ্রষ্টা শক্তিকে আর গ্রহণ করিনি। ওকে চিরকালের জন্য ঐ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি।

মীনকেতু॥ (হাসিয়া উঠিয়া) ভুল করেছ বন্ধু! রামের মতই রামভুল ক'রে বসেছ! ও-শক্তি ভ্রষ্টা নয়, ও সীতার মতই সতী!

চন্দ্রকেতু॥ এইবার তারই অগ্নি-পরীক্ষা হবে! কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও লোকলজ্জায় ওকে গ্রহণ করতে পার্‌ব না। আমাদের মাঝে চির-নির্ব্বাসনের যবনিকা প'ড়ে গেছে!

[সহসা দশদিক আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল। যশল্মীর-রাজ্যেশ্বরী জয়ন্তী ও সেনাপতি উগ্রাদিত্যের প্রবেশ ও শঙ্খ তূর্য্যধ্বনি]

জয়ন্তী॥ (চন্দ্রকেতুর পানে তরবারী আগাইয়া দিয়া)

না সেনাপতি! ওকে নির্ব্বাসন দিলে রামের মত তোমারও চরম দুর্গতি হবে। এই ধর তোমার পরিত্যক্তা শক্তি। আমি অগ্নিশিখা। ওর অগ্নি-শুদ্ধি হ'য়ে গেছে।

চন্দ্রকেতু॥ (বিস্ময়-অভিভূত কণ্ঠে চমকিত হইয়া) সম্রাট্! সম্রাট্! এই—এই সেই মহীয়সী নারী! এই জয়ন্তী!

[মীনকেতু তরবারী মোচন করিয়া জয়ন্তীর দিকে এবং জয়ন্তীও মীনকেতুর দিকে অভিভূতের মত বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দূরে মধুর সুরে বংশী বাজিয়া উঠিল। সহসা মীনকেতুর হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল। উগ্রাদিত্যের চক্ষু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত জ্বলিতে লাগিল।]

উগ্রাদিত্য॥ রাণী, আমি কি এদের বন্দী কর্‌তে পারি?

জয়ন্তী॥ উগ্রাদিত্য, পরাজিত হ'লেও ইনি সম্রাট্। ওঁর সম্মান রেখে কথা বল।

উগ্রাদিত্য॥ মার্জ্জনা কর রাণী, যে পরাজিত হয় তার বন্দী ছাড়া আর কোনো সংজ্ঞা নেই। সম্রাট্ হ'লেও সে বন্দী।

জয়ন্তী॥ বন্দী কর্‌তে হয়, আমি নিজ হাতে বন্দী কর্‌ব।

মীনকেতু॥ তুমি কোন্ পথ দিয়ে এলে রাণী?

জয়ন্তী॥ তোমার পরাজয়ের পথ দিয়ে সম্রাট্! এখন তুমি কি স্বেচ্ছায় বন্দী হবে, না যুদ্ধ কর্‌বে?

মীনকেতু॥ যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ রাণী! যেদিন তুমি আমার রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছ, সেইদিনই ত আমার পরাজয় হ'য়ে গেছে!

জয়ন্তী॥ শুধু ঐ টুকুতেই শেষ হবে না সম্রাট্। তোমাকে চরম পরাজয়ের লজ্জা স্বীকার কর্‌তে হবে আমার কাছে—নারীর শক্তির কাছে। তোমাকে শিকল পর্‌তে হবে এবং সে শিকল সোনার নয়!

মীনকেতু॥ সুন্দর হাতের ছোঁয়ায় লোহার শিকলই সোনা হ'য়ে উঠ্‌বে। (হাত আগাইয়া) বন্দী কর রাণী!

জয়ন্তী॥ কিন্তু বিনা যুদ্ধে তুমি হার মান্‌বে? আমার কাছে না-হয় হার মানলে, কিন্তু ঐ উগ্রাদিত্য, আমার সেনাপতি—ওর কাছেও কি পরাজয় স্বীকার কর্‌বে।

মীনকেতু॥ (উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া) ও কে? ওকে ত দেখিনি! ও ত এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

উগ্রাদিত্য॥ (হিংস্র হাসি হাসিয়া) আমি পাতাল-তলের দৈত্য, সম্রাট্! আজ তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তেই হবে। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন।

মীনকেতু॥ (জ্বলন্ত চোখে উগ্রাদিত্যের দিকে চাহিয়া) হাঁ। ওর সাথে যুদ্ধ করা যায়! ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত

অপরাজেয় পৌরুষের পাষাণে মোড়া! হাঁ, সত্যকার পুরুষ দেখ্‌লুম। আমার সমস্ত মাংসপেশী ওকে দেখে লোহার মত শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্তের উন্মাদনা জেগে উঠ্‌ছে। নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব সেনাপতি। কিন্তু কি পণ রেখে যুদ্ধ কর্‌বে তুমি?

উগ্রাদিত্য ॥ (হিংস্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জয়ন্তীকে দেখাইয়া) আমার পণ এই অমৃত-লক্ষ্মী, সম্রাট্! যার লোভে আমি পাতাল ফুঁড়ে ঐ অমৃতলোকে উঠে গেছি শক্তির ছদ্মবেশে। তাকে যদি আজ জয় কর্‌তে না পারি, তাহ'লে আমার তোমার হাতে মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি!

জয়ন্তী ॥ (দৃপ্তকণ্ঠে) উগ্রাদিত্য! তুমি তাহ'লে ছদ্মবেশী লোভী, শক্তিধর নও?

উগ্রাদিত্য ॥ আজ আমি সত্য বলব বাণী। আমি অসুর-শক্তি নই, আমি লোভ-দানব। আমার বাহুতে যে অমিত শক্তি, তা আমার ঐ অপরিমাণ ক্ষুধারই কল্যাণে। আজ আমার সত্য প্রকাশের চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত!

জয়ন্তী ॥ মিথ্যাচারী! (মীনকেতুর পতিত তরবারী তুলিয়া মীনকেতুর হাতের দিয়া) আর আমার ভয় নেই সম্রাট্, তুমি জয়ী হবে! ও শক্তির প্রতীক নয়, ও লোভীর ক্ষুধাজীর্ণ-মূর্ত্তি, তোমার এক আঘাতেই ও চূর্ণীকৃত হ'য়ে যাবে।

উগ্রাদিত্য॥ কি সম্রাট্, তুমি কি ঐ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রই গ্রহণ কর্‌বে, না রিক্তহস্তে আত্মরক্ষা কর্‌বে?

মীনকেতু॥ (হাসিয়া) আমি চন্দ্রকেতু নই, উগ্রাদিত্য। আমারি শিথিল মুষ্টির জন্য যে শক্তি পতিত হয় তাকে আমার হাতে তুলে নিতে লজ্জা নেই। তুমি লোভ-দানব. তোমার উদরে দশ মুখের ক্ষুধা, হস্তে বিশ হস্তের লুণ্ঠন আর প্রহরণশক্তি! তোমার সঙ্গে অহিংস-যুদ্ধ করা চলে না! আমি অস্ত্র গ্রহণ কর্‌লুম।

উগ্রাদিত্য॥ তোমার পণ?

মীনকেতু॥ আমারও পণ ঐ অমৃত-লক্ষ্মী।

(মীনকেতু চতুর্থবার তরবারী আঘাত করিতেই উগ্রাদিত্য পড়িয়া গেল)

জয়ন্তী॥ (সহসা কাঁপিয়া উঠিয়া) সম্রাট্! মীনকেতু ও কি কর্‌লে তুমি, তোমায় দিয়ে একি করালুম্ আমি? ও যে আমার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা সব—ঐ লোভ, ঐ ক্ষুধার শক্তি নিয়েই যে তোমায় জয় কর্‌তে বেরিয়েছিলুম! উঃ! মীনকেতু! আজ আমার প্রথম মনে হচ্ছে, আমি রাজ্য শাসনের রাণী নই, অশ্রুজলের নারী!

[চন্দ্রিকার প্রবেশ]

চন্দ্রিকা॥ একি! এ কোথায় এলুম! এই কি অন্ধপতির-প্রেমে-অন্ধ গান্ধারীর দেশ? এই কি হৃদয়ের সেই চির-

রহস্যময় পুরী? ওরা কারা দাঁড়িয়ে? মূক, মৌন, ম্লান! ঐ কি আলেয়ার-পিছনে-ঘুরে-মরা চির-পথিকের দল? ওরা সব যেন চেনা! ওদের কোথায় কোন্ লোকে যেন দেখেছি! (পতিত উগ্রাদিত্যকে দেখিয়া) ও কে?—দিদি? আর এ কে?—অ্যাঁ! উগ্রাদিত্য? এখানে এত রক্ত কেন? (আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল) উগ্রাদিত্য! এ কি! কে তোমায় হত্যা কর্‌লে? দিদি! দিদি!

মীনকেতু॥ (শান্ত স্বরে) দেবী! উগ্রাদিত্যকে আমিই হত্যা করেছি! ও দৈত্য, অমৃত পান কর্‌তে এসেছিল! ওই ওর নিয়তি!

জয়ন্তী॥ চন্দ্রিকা! উগ্রাদিত্য চ'লে গেছে আমার সকল শক্তি অপহরণ ক'রে। তুই পার্‌বি চন্দ্রিকা, ওকে বাঁচাতে তোর তপস্যা দিয়ে? নইলে আমি বাঁচ্‌ব না! ওকে বাঁচাতেই হবে!

চন্দ্রিকা। দিদি! ওকে নিয়ে তোমার চেয়ে আমার প্রয়োজনই যে বেশী! ওকে না বাঁচালে আমাদের পৃথিবী যে চিরসন্ন্যাসিনী হ'য়ে উঠ্‌বে! এর জন্য যদি মৃত্যু-রাজার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তা'ও দাঁড়াব গিয়ে! সাবিত্রীর মত আমার এই শবের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার তপস্যা আজ হ'তে সুরু হ'ল। আজ হ'তে আমার নাম হবে কল্যাণী।

জয়ন্তী ॥ (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, তুই রক্ষ-কুলবধূ প্রমীলার মত স্বামীসোহাগিনী হ'য়ে, সহমরণ নয়, সহ-জীবন লাভ কর! (মীনকেতুকে নমস্কার করিয়া) বন্ধু! নমস্কার! আমি তোমায় বন্দী কর্‌তে এসেছিলুম, হয়ত-বা বন্ধন নিতেও এসেছিলুম। কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হ'য়ে গেল। উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা সকল লোভের অবসান হ'য়ে গেল! আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী! (একটু থামিয়া) আমি এই সুদূর পৃথিবীতে সন্ন্যাসিনী হতে আসিনি! বধূ হবার, জননী হবার তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বেলে তোমাকে জয় কর্‌তে এসেছিলুম। তোমাকেও পেলুম, কিন্তু বুকের সে আগুন আমার নিভিয়ে দিয়ে গেল উগ্রাদিত্য!

মীনকেতু ॥ জয়ন্তী! তুমিও কি তবে ওকে ভালোবাসতে? জয় ক'রেও কি আমার পরাজয় হ'ল? উগ্রাদিত্য ম'রে হ'ল জয়ী! যাকে পণ রেখে জয় কর্‌লুম—সে কি আপন হ'ল না?

জয়ন্তী ॥ কায়াহীন ভালোবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি ত তাদের দলের নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্ত্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় কর্‌লুম—সেই ত ছিল উগ্রাদিত্য। তোমার হাতে তার পতন হ'য়ে গেছে! বন্ধু! বিদায়!

মীনকেতু॥ (আর্ত্তকণ্ঠে) জয়ন্তী! আর কি তবে আমাদের দেখা হবে না?

জয়ন্তী॥ হয়ত হবে, হয়ত-বা হবে না! যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়, কল্যাণীর সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে, আমি আবার আসব! সেনাপতি নমস্কার!

[প্রস্থান

মীনকেতু॥ (উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল) জয়ন্তী! জয়ন্তী!

(দূর হইতে জয়ন্তীর স্বর ভাসিয়া আসিল। "মীনকেতু"।)

—যবনিকা—

ঝিলিমিলি

ঝিলিমিলি

প্রথম দৃশ্য

[মির্জ্জা সাহেবের দ্বিতল বাড়ীর ওপর-তলার প্রকোষ্ঠ। মির্জ্জা সাহেবের ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগ শয্যায়-শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিম দরজা খোলা। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পার্শ্বে বসিয়া মির্জ্জা সাহেবের পত্নী হালিমা বিবি মেয়েকে পাখা করিতেছেন। বাদলার ও বেলা-শেষের অন্ধকারে ঘরের আঁধার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। হালিমা বিবি উঠিয়া হেরিকেন জ্বালিলেন।]

ফিরোজা॥ মা!

হালিমা॥ (ছুটিয়া আসিয়া ফিরোজার মুখের কাছে মুখ রাখিলেন) কি মা! সোনা আমার!

ফিরোজা॥ বাতি নিবিয়ে দাও!

হালিমা॥ কেন মা? বড্ডো আঁধার যে! ভয় ক'র্‌বে না?

ফিরোজা॥ উহুঁ। তুমি আমায় ধ'রে ব'সে থাক। (মা-কে জড়াইয়া ধরিল।) বাতি বিশ্রী লাগে।

হালিমা॥ তা ত লাগ্‌বেই মা! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করিলেন)। আচ্ছা, আমি কাগজ আড়াল ক'রে দিই। কেমন ?

ফিরোজা॥ না তুমি নিবিয়ে দাও। (রোগ-শীর্ণ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল)। দাও শীগ্‌গীর!

হালিমা॥ কেঁদো না মণি, মা আমার। এই আমি নিবিয়ে দিচ্ছি। (বাতি নিবাইতে গেলেন। ততক্ষণে কতকগুলো বাদ্‌লা পোকা আসিয়া বাতি ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল। ফিরোজা তাহাই এক মনে দেখিতে লাগিল)।

ফিরোজা॥ নিবিয়ো না মা। আমি বাদ্‌লা পোকা দেখবো!

হালিমা॥ (হাসিয়া ফিরিয়া আসিলেন) ক্ষ্যাপা মেয়ে! আচ্ছা নিবাবো না। পোকা যে গায়ে মুখে এসে প'ড়বে মা, বাতিটা একটু সরিয়ে রাখি।

ফিরোজা॥ (চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)। না! আমি বল্‌ছি, বাদ্‌লা পোকা দেখ্‌বো!

হালিমা॥ (কন্যাকে চুমু দিলেন) লক্ষ্মী মা আমার!

অত জোরে কথা কোয়ো না! ওতে অসুখ বেশী হয়। আমি বাতি সরাচ্ছি নে।'

ফিরোজা॥ (চুপ করিয়া বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল) মা, আমায় একটা বাদ্‌লা পোকা ধ'রে দাও না!

হালিমা॥ ছি মাণিক! পোকা ছুঁতে নেই! তুই আজ অমন কর্‌ছিস্ কেন ফিরোজা?

ফিরোজা॥ (কান্নার সুরে) দাও বল্‌ছি। নৈলে চেঁচিয়ে রাখ্‌বো না কিছু!

হালিমা॥ লক্ষ্মী, মা! কেঁদো না। এই দিচ্ছি। (একটা বাদ্‌লা পোকা ধরিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। ফিরোজা হাতে করিয়া এক মনে বাদ্‌লা পোকা দেখিতে লাগিল।)

ফিরোজা॥ এই যাঃ, পাখা খ'সে গেল! আ-হা রে! আচ্ছা মা! বাদ্‌লা পোকার খুব লাগ্‌ল?

হালিমা॥ তা লাগ্‌ল বই কি!

ফিরোজা॥ তা হ'লে ছেড়ে দিই ওকে। মা, তুমি ওকে নীচে রেখে এস (হালিমা বাদ্‌লা পোকা নীচে রাখিয়া আসিলেন)। ....মা, বাইরে খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে, না?

হালিমা॥ হাঁ মা, খুব বৃষ্টি। শুন্‌ছ না ঝম্‌ঝমানী?

ফিরোজা ॥ আমার খুব ভাল লাগে ঐ বৃষ্টির শব্দ।.... মা, আব্বা * কোথায় ?

হালিমা ॥ বাইরে, দহ্‌লিজে * বোধ হয়।

ফিরোজা ॥ এখন যদি আমি খুব জোরে কাঁদি, আব্বা শুন্‌তে পাবেন ?

হালিমা ॥ ছি মা, কাঁদবে কেন ? ওঁকে ডেকে পাঠাব ?

ফিরোজা ॥ না, না, ডেকো না। মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে! আচ্ছা মা, তুমি যদি এখন গান কর, আব্বা শুনতে পাবেন ?

হালিমা ॥ ওরে দুষ্টু! বুঝেছি তোমার মতলব।....... না মা, এখন কি আর গান করে ? তোর আব্বা শুনলে রাগ ক'রবেন।

ফিরোজা ॥ এত বৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছেন কি না! মা, লক্ষ্মী মা, সোনা-মা, আস্তে আস্তে গাও না! সেই বৃষ্টি ঝরার গানটা।

হালিমা ॥ আচ্ছা গাচ্ছি আস্তে আস্তে। এখন কি আর গান আসে রে ফিরোজ ? সেই কখন্ ছেলেবেলায় গেয়েছি গান। এখানে এসেই তা ভুল্‌তে চেষ্টা করেছি। তোর আব্বা বড্ডো রাগ করেন গান শুনলে!

---

* দহ্‌লিজ—বাহির-বাটী।　　* আব্বা—বাবা।

ফিরোজা ॥ আচ্ছা মা, গান শুনেও কেউ রাগে ? আব্বা আচ্ছা মানুষ যা হোক !

হালিমা ॥ আগে কিছু দিন রাগ কর্‌তেন না ।....গান ত প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম । কেবল তোর জন্যেই আজো দু-একটা মনে আছে ।

ফিরোজা ॥ আব্বা আগে রাগ করতেন না মা, তুমি গান ক'র্‌লে ?

হালিমা ॥ না....তুই এখন গান শোন্ ।

(গান)

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন-ধারা এ শাওনে ।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে ॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন ছায় রে,
ডাহুকীরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে আঁধার গহনে ॥
কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া ।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে ।
মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে ॥

ফিরোজা॥ মা! জান্‌লাটা খুলে দাও। আমি মেঘ দেখব!

হালিমা॥ লক্ষ্মী মা! জান্‌লা খোলে না। ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং একটা গান করি, তুই শোন।

ফিরোজা॥ না মা। আর গান আমি সইতে পার্‌ব না। খোলো না মা, জান্‌লাটা।···(হালিমা দক্ষিণের জানালা খুলিতে গেলেন) ওটা না মা, ঐ পূব দিককার জানালাটা খোলো। পূবের হাওয়ায় কদম ফোটে, না মা?

হালিমা॥ ও দিক্‌কার জান্‌লা খুল্‌লে তোর আব্বা আমায় আর জ্যান্ত রাখবেন না ফিরোজ! এই দক্ষিণের জানালাই খুলি। (দক্ষিণের বাতায়ন খুলিলেন। দূরে বনের আভাস দেখা যাইতেছে! বৃষ্টিধারায় বন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে।)

ফিরোজা॥ (দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া পাশ ফিরিল। আবার পাশ ফিরিয়া আগেকার মত করিয়া শুইয়া জানালার দিকে তাকাইয়া থাকিল। বোধ হয় সে কাঁদিতেছিল।) মা!

হালিমা॥ মা আমার! তুই কাঁদছিস ফিরোজ?

ফিরোজা॥ আচ্ছা মা, আব্বা তোমায় খুব ভালবাসেন?

হালিমা॥ জানি না! (চক্ষু মুছিলেন)

ফিরোজা। আগে খুব ভালোবাস্‌তেন?

হালিমা ॥ বাতিটা এখন সরিয়ে রাখি? তোর চোখে লাগ্‌ছে, না?

ফিরোজা ॥ আচ্ছা রাখ। কিন্তু তুমি বল...

হালিমা ॥ (বাতি সরাইয়া রাখিলেন।) এখন একটু চুপ ক'রে ঘুমোও ত ফিরোজ! বক্‌লে আবার অসুখ বাড়বে।

ফিরোজা ॥ আচ্ছা, তুমি না-ই বল্‌লে। আমি সব বুঝি। আব্বা কখখনো কাউকে ভালোবাসেন নি। নইলে মানুষ কখনো এমন নীরস আর নিষ্ঠুর হয়!

হালিমা ॥ তুই কি থাম্‌বি নে ফিরোজ? লক্ষ্মী মা আমার, কেন মন খারাপ ক'রছ এত, বল ত! আজ যে তোকে চুপ ক'রে থাক্‌তে ব'লে গেছে ডাক্তার।

ফিরোজা ॥ আচ্ছা মা, কাল থেকে ঐ পূব দিককার জান্‌লাটা খুল্‌বে ত? তখন ত আর আব্বা বক্‌বেন না?

হালিমা ॥ (শিহরিয়া উঠিলেন, কান্নায় তাঁহার গলা ভাঙিয়া আসিল।) ও কি কথা বল্‌ছিস্‌ ফিরোজ?

ফিরোজা ॥ কাল আর ও-জান্‌লা খুল্‌তে বল্‌ব না মা! (বালিশে মুখ লুকাইল।)

হালিমা ॥ (হঠাৎ পাথরের মত স্থির হইয়া গেলেন। কণ্ঠ তাঁহার অশ্রু-বিকৃত হইয়া উঠিল।) বুঝেছি রে হতভাগী, সব বুঝেছি। তুই আমাদের বড় শাস্তি দিয়ে যাবি।...মা, এই

আমি খুলে দিচ্ছি পূব-জানালা, তুই অত অধীর হ'স্ নে।
(পূব জানালা খুলিয়া দিতেই সম্মুখের বাড়ীর মৃদু-আলোকিত বাতায়ন দেখা গেল। বাতায়ন-পথে কে যেন ছট্‌ফট করিয়া ফিরিতেছে। দূর হইতে তাহাকে ছায়া-মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। ছায়া-মূর্ত্তি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল যেন এই বাতায়ন পানেই সে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। হালিমা আড়ালে চক্ষু মুছিলেন।)

ফিরোজা॥ (ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে তাকাইয়া রহিল।) মা, বাঁশী বাজছে না? উঁহুঁ, কে যেন কাঁদছে। (অস্থির হইয়া) বাইরে কে কাঁদে মা? মা, মা, শোনো!

হালিমা॥ কই মা, কিছু না। ও বৃষ্টির ঝর্‌ঝরানো।··· হুঁ···না···হাবিব বুঝি গান কর্‌ছে এস্‌রাজ বাজিয়ে।

ফিরোজা॥ আহ্। বৃষ্টিটা যদি থামত, গানটা শুন্‌তে পেতাম···বৃষ্টি থেমে আস্‌ছে—না মা?

হালিমা॥ হাঁ মা, বৃষ্টিটা ধ'রে এল।

ফিরোজা॥ মা—মা! এইবার শুন্‌তে পাচ্ছি গান। আহ্। একটু শব্দ না হয় যেন। মা তুমি চুপ ক'রে শোনো। (বাতায়ন হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছিল)।

ঝিলিমিলি

(গান)

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥
স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে।
বাহির আমার পিছল হ'ল কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।
পার হ'তে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়—ওগো বে-দরদী—
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

[গান শেষ হইলে বাতায়নের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই আলোকে এক প্রিয়দর্শন তরুণের মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে এই দিকেই তাকাইয়া আছে।]

ফিরোজা॥ মা—মা-মণি! ঘরের বাতিটা খুব উজ্জ্বল ক'রে দাও। যেন আমায় খুব ভাল ক'রে দেখা যায় ও বাড়ী হ'তে! (বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল)।

হালিমা॥ ওরে ফিরোজ! বন্ধ কর্, বন্ধ কর্ পূব-জানালা! তোর আব্বা আসছেন! (মির্জ্জা সাহেব গৃহে

প্রবেশ করিতেই একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিবিয়া গেল। হালিমা আবার বাতি জ্বালাইলেন)।

মির্জ্জা সাহেব॥ আর জান্‌লা বন্ধ কর্‌তে হবে না। আমি বহুক্ষণ থেকেই তোমাদের কীর্ত্তি দেখছি। দেখ আর যা-ই কর, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা ক'রো না। (হালিমা নিরুত্তর)···আর ঐ বাঁদর ছোঁড়াটাকেই বা কি বলি! এক গাছা কাঁচা বেত নিয়ে বেতিয়ে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত········(ক্রোধে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিলেন।) দিনরাত গান আর গান! বাঁশী আর এস্‌রাজ! স্থিরচিত্তে একটু "কোর্-আন তেলাওত্" করবার কি নমাজ পড়বার জো নেই! হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! ঐ নিশ্ব-বখাটে আবার বলে, পাশ করবে বি-এ! ও ত ফেল ক'রেই আছে। ঐ রত্নের সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে!

হালিমা॥ দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একটু আস্তে কথা কও, আজ ফিরোজা কেমন যেন কর্‌ছে!

মির্জ্জা সাহেব॥ (পূব দিককার জানালাটা বন্ধ করিতে করিতে) হুঁ!···তা এমন ক'রে জান্‌লা খুলে তাকিয়ে থাকলে যে-কোনো আইবুড়ো মেয়েরই অসুখ করে!····দেখ, তুমিই ফিরোজার মাথা খেলে। আর ওই বুড়ো বয়সেও তোমার

গান গাওয়ার অভ্যেস গেল না। কী ভুলই ক'রেছি স্কুলে-পড়া মেয়ে বিয়ে করে!

হালিমা॥ সত্যি, এ ভুল না হ'লে দুই জনই বেঁচে যেতাম। আমি এ কথা ভাবতে পারি নে যে, কোন কোন গ্র্যাজুয়েট গোঁড়ামীতে কাঠ-মোল্লাকেও হার মানায়!

মির্জ্জা সাহেব॥ শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানাকে তুমি গোঁড়ামী মনে কর এ অভিযোগ ত বহুবার শুনেছি হালিমা। আর কোনো নতুন কথা শোনাবার থাকে ত বল!

হালিমা॥ আছে। তোমার মত শরীয়তের টিন বাঁধানো হৃদয়ে তা কি লাগবে?···একটু আগে গানের খোঁটা দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে পারি জেনেই তুমি আমায় বিবাহ ক'রে কৃতার্থ হয়েছিলে।

মির্জ্জা সাহেব॥ ভুলি নি সে কথা! কিন্তু তখন জানতাম না যে, তোমার গান শুধু চোখের জল, শুধু ব্যথা। কেন গান শরীয়তে নিষিদ্ধ তা আমার চেয়ে কেউ বেশী বুঝবে না! শরীয়তে যিনি সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিলেন, তিনি জানতেন এর ব্যথা দেওয়ার পীড়া দেওয়ার শক্তি কত!

হালিমা॥ আমি এও জানি, যিনি এই শরীয়তের স্রষ্টা, তিনি গান শুনে আনন্দও পেয়েছেন। যাক, তর্ক করবার স্থান এ নয়। মেয়েটাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবে কি?

মির্জ্জা সাহেব॥ দেখ, জীবনে হয় ত শান্তি দিই নি তোমাদের। আমার বিশুষ্ক জীবনে তোমাদের জন্যে হাসির ফুল ফুটাতে পারি নি, শুধু কাঁটাই ফুটিয়েছি। কিন্তু মরণেও তোমাদের অশান্তি হান্‌ব এত বড় গালি আমায় না-ই দিলে! (হালিমা চমকিয়া উঠিলেন, ফিরোজা পাশ ফিরিয়া জল-সিক্ত চোখে তাহার বাবার দিকে তাকাইল,—মির্জ্জা সাহেব পায়চারী করিতে লাগিলেন।)

ফিরোজা॥ আব্বা! আমার পাশে এসে বসো।

মির্জ্জা সাহেব॥ (কাঁপিয়া উঠিলেন)....হালিমা! তুমি ফিরোজাকে দেখো, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে চল্‌লাম!

ফিরোজা॥ আব্বা! আব্বা! দেখছ না কি রকম ঝড়বৃষ্টি শুরু হ'ল আবার! তুমি যেয়ো না। আমি আর ওষুধ খাব না। একটু কাছে এসে বসো আজ লক্ষ্মীটি।

মির্জ্জা সাহেব॥ (হঠাৎ শুষ্ক হইয়া উঠিলেন।) কিন্তু আমি থাক্‌লে ত তোমার অসুখ আরো বেড়ে উঠবে মা!

ফিরোজা॥ না, আজ আর বাড়বে না। তুমি এস (মির্জ্জা সাহেব ফিরোজার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন)....আব্বা, আজ আমি খুব যা তা বক্‌ব, তুমি কিছু বল্‌বে না বল।

মির্জ্জা সাহেব॥ আচ্ছা মা, বল।

ফিরোজা ॥ তুমি ঐ পূব-জান্‌লাটা খুল্‌তে দাও না কেন?

মির্জ্জা সাহেব ॥ (হঠাৎ কঠোর হইয়া উঠিলেন) ও ব্যাটা পাজি নচ্ছার, বাঁদর !....কিন্তু মা, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ। ও যদি বি-এ পাশ কর্‌তে পারে এবার, তা হ'লে ঐ বাঁদরের গলাতেই এই মোতির মালা দেবো—এও ত ব'লে রেখেছি।

ফিরোজা ॥ কিন্তু আমি ত আর ভাল হব না আব্বা।

মির্জ্জা সাহেব ॥ (শিহরিয়া উঠিলেন।) না মা, ভাল হবে। এখনই ত ডাক্তার আস্‌বে।

ফিরোজা ॥ উঁহুঁ, কিছুতেই ভাল হব না আমি।.... আচ্ছা আব্বা, তুমি ওকে এ-বাড়ী আস্‌তে দাও না কেন ?

মির্জ্জা সাহেব। (হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া) আমি ওকে খুন ক'র্‌ব ! শয়তান আমার মেয়েকে খুন করেছে !

(বাহির দ্বারে করাঘাত শোনা গেল)

হাবিব ॥ আমি এসেছি। আমায় খুন করুন।....মা, একটিবার দোর খুলে দিন।

মির্জ্জা সাহেব ॥ খবরদার ! কেউ দোর খুলো না। বেরোও পাজী এখান থেকে।

হাবিব ॥ পাশের খবর বের হ'য়েছে।

মির্জ্জা সাহেব ॥ পাশ ক'রেছ ?

হাবিব ॥ এখনও খবর পাইনি। তার ক'রেছি। হয়ত এখুনি খবর আসবে।

মির্জ্জা সাহেব ॥ মিথ্যাবাদী! আগে খবর আসুক তার পর এসো। এখন বেরোও। মেয়ের অসুখ বেড়েছে।

হালিমা ॥ আহা, দাও না বাছাকে আসতে। একটু দেখে যাবে বই ত নয়! ক'দিন থেকে ছেলেটা যেন ছট্‌ফটিয়ে মরছে।

মির্জ্জা সাহেব ॥ হ্যাঁ, আর সেই দুঃখে নতুন নতুন গান গাওয়া হ'চ্ছে। চুপ কর তুমি। (চীৎকার করিয়া) এখনো দাঁড়িয়ে আছ ?

হাবিব ॥ আছি। আমায় খুন করবেন বলেছিলেন। করুন, তবুও একবার দোর খুলুন মির্জ্জা সাহেব।

মির্জ্জা সাহেব ॥ দেখেছ ব্যাটার মতলব! নিশ্চয় সাথে পুলিশ নিয়ে এসেছে। আমায় বলিয়ে নিতে চায়, যে আমি খুন করব বলেছি। আমি ককৃখনো খুন করব বলি নি, তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়!

ফিরোজা ॥ কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।

হাবিব ॥ পেয়েছ ?

ফিরোজা ॥ হাঁ, পেয়েছি।

হাবিব ॥ কিন্তু, আমি ত পাই নি।

ফিরোজা ॥ কাল পাবে। আমি আজ তোমার উদ্দেশে যাব পূব-জানালা দিয়ে। তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলি-মিলি খুলে রেখো।

হাবিব ॥ কিন্তু তোমার বাতায়ন ত রুদ্ধ।

ফিরোজা ॥ যখন যাব, তখন আপ্‌নি খুলে যাবে।

হাবিব ॥ তবে যাই আমি।

ফিরোজা ॥ যাও। যাওয়ার কালে আমার ঝিলিমিলি তলে সেই যাওয়ার গানটা শুনিয়ে যাও।

(হাবিবের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

শুকাল মিলন-মালা আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥
রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝু'রে বলে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই॥
যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি' পুণ্য হোক

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ-কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই ॥

ফিরোজা ॥ মা! মা! আমার কেমন করছে! মাগো, তুমি আমায় ধর! আব্বা, তুমি যাও! তোমায় ভাল লাগে না।....মা! মা! এত বাতি জ্ব'লে উঠল কেন?

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।)

হালিমা ॥ ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাও ডাক্তারকে দেখ একটু। মা! সোনা মা আমার! লক্ষ্মী মা! ফিরোজ!

মির্জ্জা সাহেব ॥ ফিরোজ! মা! তুই ফিরে আয়! আমি হাবিবকে ফেরাতে যাচ্ছি। (বিদ্যুৎ বেগে বাহির হইয়া গেলেন।)